উৎসারিত আলো

ড. সব্যসাচী গুহর
উক্তিসমূহ ও
কবিতাসমূহের সংকলন

সংকলক
রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বিষয়—কপিরাইট

কপিরাইট প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সব্যসাচী বরাবরই তাঁর অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। সব্যসাচী বলেন—"তোমরা যা ভালো বোঝ তাই কর। আমি আমার গান গেয়ে যাব, কে শুনবে, না শুনবে সে ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই।" সুতরাং কপিরাইট প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানা হল।

উৎসর্গ

অতীতে যাদের জীবনে প্রকৃতিপ্রদত্ত শৃঙ্খলার পুনর্জন্ম ও পুনর্বিন্যাস ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যাদের জীবনে প্রকৃতিপ্রদত্ত শৃঙ্খলার পুনর্জন্ম ও পুনর্বিন্যাস ঘটবে তাদের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদক : রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
ডিটিপি : পিনাকী চক্রবর্তী
প্রুফ নিরীক্ষণ : স্বপন মজুমদার/নান্নু মাহবুব
প্রচ্ছদ অলংকরণ : সোমনাথ পাল
প্রচ্ছদের ছবিগুলি শুভাশিষ ভট্টাচার্য্য ও গোল্ডা মার্কোভিকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মুখবন্ধ

সব্যসাচী গুহর ইংরাজি কথোপকথন থেকে বিভিন্ন উক্তির বঙ্গানুবাদ এবং অন্যান্য পুস্তক ও চিঠিপত্র থেকে তাঁর প্রবাদপ্রতিম কিছু উক্তি একত্র করে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।* দ্বিতীয় খণ্ডে সব্যসাচীর শারীরিক রূপান্তরের অব্যবহিত পরে লিখিত আঠাশটি কবিতা সংকলিত করে এই পুস্তকে প্রকাশ করা হল।

আধ্যাত্মিক রত্নসমূহের আকর এই কবিতা ও উক্তিগুলি হয়তো কোনও পথহারা, হতাশাগ্রস্ত মুমুক্ষুর জীবনে আশার আলো জ্বালাতে বা পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে, যেমন জেন মাস্টারের একটা 'হাইকু' দীর্ঘকাল সাধনা করা হতাশ, পথহারা জেন সাধকের ভ্রান্তি দূর করে তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। বর্তমানকালে বৃহৎ পুস্তক পাঠ করে তার নির্যাস সংগ্রহ করার মতো পাঠককুলের সংখ্যা নগন্য, তাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মাধ্যমে বৃহৎ পাঠক সমাজের কাছে সব্যসাচীর বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সব্যসাচীকে কেন্দ্র করে যে বিরাট এবং মহৎ শক্তিক্ষেত্র ও উচ্চ চেতনার স্তর বিশ্বের বুকে উন্মোচিত হয়েছে, আগ্রহী মুমুক্ষুদের কাছে তার বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং তার সান্নিধ্যে মানুষের মধ্যে যে মঙ্গলময় প্রভাব ক্রিয়া করে তা উপলব্ধি করার সোপান হিসাবে এই পুস্তকটির পরিকল্পনা ও প্রকাশ।

পুস্তকটির প্রথম খণ্ডের জন্য শ্রীমতি প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য্য একটি সরল মনোগ্রাহী ভূমিকা লিখে দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম স্বভাবকবি যশোর, বাংলাদেশ নিবাসী নান্নু মাহবুব কবিতার মাধ্যমে এক অনন্যসাধারণ গভীর অর্থবহ ও প্রাণস্পর্শী ভূমিকা লিখেছেন। এছাড়া শ্রী স্বপন মজুমদার, শ্রী তাপস চক্রবর্তী ও শ্রীমতি সংগীতা চক্রবর্তী ও ড. পার্থকৃষ্ণ ঘোষ সব্যসাচীর উক্তি ও কবিতাসমূহের উপর পর্যালোচনা করে চারটি অনবদ্য লেখা উপহার দিয়েছেন। সব্যসাচীর কবিতা এবং উক্তিগুলির মর্মস্থলে পৌঁছতে এই ভূমিকা দুটি এবং পর্যলোচনামূলক লেখা চারটি পাঠককুলকে সাহায্য করতে পারে। লেখকদের সকলকে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সংকলক

---

* ইংরেজি উক্তির অধিকাংশ পাওয়া যাবে গোল্ডা মার্কোভিক সংকলিত—"Paripurna Astha—Complete Trust" পুস্তকটিতে।

সব্যসাচী গুহ : এক প্রচ্ছন্ন ভারতীয় ঋষি

কলকাতার উপকণ্ঠে হুগলি জেলার হিন্দমোটরের প্রথিতযশা লোকপ্রিয় ডাক্তার স্বর্গীয় অজিতরঞ্জন গুহর জ্যেষ্ঠপুত্র সব্যসাচীর জন্ম কলকাতায়, ১৯৫৩ সালের ১লা মে। তাঁর মাতা ছিলেন ধর্মপ্রাণা ভক্তিমতী ঁসুলেখা দেবী।

ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় সব্যসাচীর পড়াশুনায় অমনোযোগ, ঘন ঘন স্কুল পালানোয় উদ্বিগ্ন মাতা পুত্রের মঙ্গল কামনায় পড়াশুনার সাথে সাথে ধর্মীয় এবং অধ্যাত্ম নিগড়ে পুত্রকে গড়ে তুলতে তাকে তাঁর গুরুদেবের পলাশী আশ্রমে স্থানান্তরিত করেন এবং আশ্রমের স্কুলে আশ্রমিক ব্রহ্মচর্য পালন ও বিদ্যালাভের ব্যবস্থা করেন। একঘেয়ে আশ্রমজীবনের গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্তি পেতে সব্যসাচী স্কুলের ছেলেদের নিয়ে ফুটবল খেলা শুরু করেন ও অল্প দিনেই নিজের দক্ষতায় ভাল খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত হন। এছাড়া এ সময় তিনি নিয়মিত যোগাসন মুদ্রা ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে হঠযোগে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। দুই বৎসর যাবৎ রোজ সূর্যোদয়ের পূর্বে বালক সব্যসাচীকে একঘণ্টা প্রার্থনা এবং ধ্যান করতে হত। প্রতি সপ্তাহে ভগবৎ গীতার শ্লোক মুখস্থ করে সেসব নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে আলোচনা করতে হত। সে সময় এ ব্যাপারে তার কৌতূহল এমন বৃদ্ধি পায় যে গরমের ছুটিতে সাইকেল নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কুঠিতে বসে ধ্যান করতেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য। পরীক্ষার ফল নেতিমূলক হওয়ায় তিনি সেসব বন্ধ করে দেন।

মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী পিতা রাজনৈতিক কারণে কারান্তরালে গেলে দুই বৎসর আশ্রমবাসের পর সব্যসাচী ফিরে আসেন হিন্দমোটরে। এর কিছুদিন পরেই পিতার কারামুক্তি ঘটে এবং তিনি স্ব-পেশায় স্থিত হন। ফুটবল খেলায় সব্যসাচীর দক্ষতা এখানেও তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে আর ভবিষ্যতে বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় হবার বাসনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে। প্রতিপক্ষের সমর্থকদের হাতে নির্যাতিত হবার ভয়ে প্রতিপক্ষকে ৫/৬টি

গোলের মালা পরিয়ে খেলা শেষ হবার আগেই সব্যসাচীকে মাঠ ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে পালাতে হত। এহেন প্রত্যুৎপন্নমতি প্রতিভাবান খেলোয়াড় যখন পিতার দেওয়া বিবেকানন্দ এবং আইনস্টাইনের বইয়ের মধ্যে আইনস্টাইনের বইটি বেছে নিয়ে খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে গৃহকোণে গভীর নিষ্ঠা, মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অধ্যয়নে মগ্ন হলেন তখন তাঁর সহপাঠীরা অবশ্যই অবাক হয়েছিলেন—সন্দেহ নেই।

স্ব-উদ্যোগে স্বল্পকালেই তিনি পাঠ্যক্রম বহির্ভূত 'ক্যালকুলাস' শিখে নেন এবং স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল ফল করে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজনের মুখে হাসি ফুটিয়ে, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন।

ভারতের বুকে হুনানের বীজ নকশালবাড়িতে সে সময় গর্জে ওঠে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মেধাবী প্রতিভাবান ছাত্র সব্যসাচী ''মেহনতি মানুষের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই''-এ সামিল হয়ে ''গ্রাম দিয়ে শহর ঘের'' স্লোগানকে বাস্তবায়িত করতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে থাকেন। অনাহার, অর্ধাহার, আশ্রয়হীন মৃত্যুর মুখোমুখি এক জীবনস্রোতে ভেসে যায় তাঁর যৌবনের অনেকগুলি দিন।

বিপ্লব ব্যর্থ হয়। সাম্যবাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়—হতাশ, ক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত সব্যসাচী ধর্মপ্রাণা মাতার গুরুদেবের বারাণসীস্থ আশ্রমে আত্মগোপন করেন।

এক গভীর রাতে একাকী গঙ্গার ঘাটে বসে থাকাকালীন জলে ভেসে আসা তাঁরই সমবয়সী এক যুবকের মৃতদেহ দেখে বিপ্লব চলাকালীন বারবার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা স্যবসাচীর অন্তরমধ্যে ধ্বনিত হয় উপনিষদের বাণী—''ত্বমেব বিদিত্বাহেতি মৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়''। আত্মজিজ্ঞাসার এই প্রথম স্ফুরণ তাঁর মনের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয় মুক্তির তীব্র পিপাসা। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে চলল পঠন-পাঠন, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বইয়ের মধ্যে উত্তর খোঁজা, ''কীভাবে তাঁকে বিদিত হওয়া যাবে? মুক্তির কী সেই পথ, পন্থা-প্রকরণ?''

বিপ্লব পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলে সব্যসাচী কলকাতায় ফিরে আসেন ও পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হন। এরপর তিনি রৌরকেল্লার

Regional Engineering College থেকে দুর্দান্ত রেজাল্ট করে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ শেষ করেন। স্নাতকোত্তর পাঠের সময় রৌরকেল্লায় থাকাকালীন দক্ষিণী ব্রাহ্মণকন্যা ড. ভামিডিপাটি লক্ষী রাওয়ের সঙ্গে সব্যসাচীর যে প্রণয়পর্ব শুরু হয়েছিল ইতিমধ্যে তা অনাড়ম্বরে শুভ পরিণয়ে পরিণতি লাভ করে। শ্রীমতী লক্ষী রাও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, মুম্বাই (IIT, Bombay) থেকে Ph.D করেন এবং সব্যসাচী ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISc) থেকে Ph.D করেন। এরপর শ্রীমতী লক্ষী গুহ কিছুদিন ব্যাঙ্গালোরে সেন্ট যোসেফ কলেজে (St. Joseph College) অধ্যাপনার কাজ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে (IISc) গবেষণার কাজে যোগদান করেন। ওই সময় সব্যসাচী ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনে (ISRO) কর্মরত ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে। দু'বছরের মধ্যেই ড. লক্ষী গুহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিস্থ রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণার কাজে চলে আসেন এবং কয়েক মাসের ব্যবধানে সব্যসাচীও ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে যুক্ত হন। এই সময় সব্যসাচী এবং লক্ষী গুহর জীবনের সঙ্গে আরো দুটি জীবন যুক্ত হয়, তাঁদের দুই কন্যারত্ন শিল্পা এবং সুমেধা।

এরপর শুরু হয় সব্যসাচীর জীবনের গবেষণার আর এক অধ্যায়—পরবর্তী বছরগুলিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্রিকাগুলিতে সব্যসাচী ও তাঁর গবেষক দলের পদার্থবিদ্যার উপর গবেষণার কাজ এবং বিষয়বস্তু নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে।

অশেষ প্রাণশক্তিতে ভরপুর সব্যসাচী জীবনের এই প্রচণ্ড কর্ম-কোলাহলের মধ্যেও জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা থেকে বিরত হননি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব এবং পরবর্তীকালে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির প্রভাব তাঁর মধ্যে আত্মজ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার বাতিটি জ্বালিয়ে রেখেছিল। অবশেষে তিনি একদিন স্বপ্নাদেশে উপলব্ধি করলেন যে শুধু পুস্তকপাঠের মাধ্যমে আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যাবে না, আধ্যাত্মিক অনুশীলনও প্রয়োজন, তখন তিনি ''রামচন্দ্র মিশন'' নামে সহজ রাজযোগ

অনুশীলনের এক সংস্থায় দীক্ষা নেন ও নিয়মিত প্রার্থনা ও ধ্যান অনুশীলন করা শুরু করেন। তরুণ বয়সে যোগাসন, প্রাণায়াম, প্রার্থনা এবং ধ্যানের যে পর্ব শেষ হয়েছিল, সেখান থেকে শুরু হল আবার গভীর অনুশীলন। জীবনের রহস্য উন্মোচনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান এবং কঠোর অধ্যবসায়ী সাধকে পরিণত করে। পরবর্তী কয়েক বৎসরে তিনি ধ্যানে শাস্ত্রে বর্ণিত সমস্ত অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিগতভাবে অনুভব, দর্শন ও উপলব্ধি করেন—যেমন অনাহত নাদ শ্রবণ, সমাধি, দিব্যদর্শন (vision in trance) ইত্যাদি।

কিন্তু এসব তাঁর অন্তরকে তৃপ্তির বদলে আরও অশান্ত করে তুলতে থাকে—মুক্তির হাতছানি সত্ত্বেও তা যেন অধরাই থেকে যায়।

এই সময় নানা ঘটনাপরম্পরায় আশ্চর্য্যজনকভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির। ইউ জীর দর্শনে, স্পর্শনে, বাক্যবাণে আগুন লেগে যায় সব্যসাচীর অন্তরের গহনে সযত্নে লালিত সংস্কারের মধ্যে।* ভেঙে যায় অহং-এর দুর্ভেদ্য বর্ম—কখনো হতাশ, কখনো হতবাক, কখনো চমকিত সব্যসাচীর মধ্যে মূলগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয় এই সময়। ঊর্ধ্বচেতনার স্ফুরণ ঘটে তাঁর মধ্যে। এই চেতনার স্ফুরণ শুধু সূক্ষ্ম শরীরে বা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পরন্তু স্থূল পঞ্চভূতনির্মিত শরীরের মধ্যে স্ফুরিত হয়ে স্নায়ুজীববিজ্ঞানভিত্তিক রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য বা ছন্দোময় অবস্থানের প্রয়োজনে তাঁর শরীরকে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করে দেয়।।

সব্যসাচী তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে দিনলিপিতে লিখেছেন—''আমার সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে আপাতত শুধু একটাই চাহিদা এবং এই চাহিদার দুরন্ত জীবনশক্তি অন্যান্য সমস্ত জাগ্রত চেতনার বিভিন্ন গতিমুখকে প্রবল পরাক্রমে দাবিয়ে রেখেছে। এই সর্বগ্রাসী চিন্তাটি হল—আমি নিজেকে এই পরিবেশের সান্নিধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করে রাখতে চাই। আমার কাছে এ এক অভূতপূর্ব পরীক্ষামূলক যোজনা। এর নেশায় আমি বদ্ধ পাগল। এ অবস্থা জীবনে দু'বার আসে না। এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করতে চাই।

*''ইউ জী-র সঙ্গে পামস্প্রীং-এ চোদ্দো দিন''—বইটিতে সব্যসাচী গুহ তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতাসমূহের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন।

কোনওরকম অতীত মানসিক প্রভাবের আওতায় না এসে অর্থাৎ এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরার জন্য ঘটনাবলী অনুধাবন করার যে সংস্কারজাত গভীর প্রবণতা আমাদের মধ্যে থাকে সে প্রবণতাকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে উপেক্ষা করে এক লাগামছাড়া অবস্থার মধ্যে থেকে সদাজাগ্রত ইন্দ্রিয়গুলির সহযোগে এক তীব্র চেতনার আলো জ্বালিয়ে রেখে দেখতে চাই স্বচ্ছভাবে, আমাদের কোন গভীরে এক তপস্যাজাত তেজস্ক্রিয়তার সান্নিধ্য কি ধরনের আন্দোলন জাগাতে পারে। সে আন্দোলনের প্রভাব কোথায় এবং কেমনভাবে জীবনের গতিবিধির মধ্যে প্রস্ফুটিত হতে পারে।''

সব্যসাচীর জীবনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার তীব্রতা বিয়াল্লিশ দিন স্থায়ী হয়েছিল। এই সময় তিনি মৃত্যু এবং নবজীবনের স্বাদ বারংবার অনুভবের মাধ্যমে অলৌকিকভাবে একাকী জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন।

এই সময় একবার নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন দিন তিনি দেহবোধশূন্য, বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ অবস্থাকে 'যোগনিদ্রা' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ওই সময় তাঁর ঘরের কলিংবেল ক্রমাগত বাজতে থাকে। কলিংবেলের শব্দে ধীরে ধীরে সব্যসাচী নিদ্রিত অবস্থা থেকে জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসেন। মাতৃপ্রকৃতির কোনও অমোঘ অজানা কারণে যেন তিনি শরীররক্ষার প্রয়োজনে নিদ্রা থেকে উত্থিত হন। সব্যসাচী ক্ষুধার্ত দুর্বল শরীরে ঘরের দরজা খুলে দেখেন প্রতিবেশী এক ভদ্রমহিলা তাঁর জন্য সুস্বাদু খাদ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—তিনি ভক্তের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন (যোগ ক্ষেম বহাম্যহম)। আর সব্যসাচী তাঁর দিনলিপিতে লিখলেন—''আমাদের জীবনে প্রকৃতিপ্রদত্ত শৃঙ্খলার পুনর্জন্ম ও পুনর্বিন্যাস ঘটলে যে মহান শক্তির উদ্ভব হয়, জীবনপ্রবাহের সমস্ত পাথেয় সেই শক্তি আপনা-আপনি সরবরাহ করে।''

অপর একটি ঘটনা প্রসঙ্গে সব্যসাচী বলেন—''একদিন হঠাৎ দেখলাম আমি ক্লান্ত হয়ে চলতে চলতে একটা গাছের নিচে বসে পড়েছি। মাথার মধ্যে এক অস্বস্তিকর দহন, মাথায় হাত দিতেই মাথার চুল উঠে যেতে লাগল, ক্রমে সমস্ত মস্তকটাই চুলবিহীন হয়ে গেল— গাছের উপর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'এ হল চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাদশা।' এরপর মস্তকের ব্রহ্মতালু

থেকে একটা আলোর স্তম্ভ আকাশের দিকে উঠে সমগ্র আকাশকে আলোকিত করে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হল—আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলাম।"

এর উপর ছিল বিয়াল্লিশ দিনব্যাপী নানা শারীরিক বিপর্যয়ের ঘটনা। এক দিন রাত্রে পেটের নাভির চারিদিকে প্রচণ্ড উত্তাপ, সঙ্গে যন্ত্রণা। বাথরুমের বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন নাভির উপরে একটা অংশ সুপারির মতন ফুলে উঠেছে। একদিন মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড উত্তাপের হলকা, মুখে উষ্ণ লালাস্রোত বইতে লাগল আর কপালের মাঝখানটা গোল হয়ে ফুলে উঠল। একদিন কম্পিউটারে বসে তন্ময় হয়ে কাজ করার সময় সব্যসাচী দেখলেন চোখের সামনে থেকে কম্পিউটারটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আস্ত একটা কম্পিউটারের এহেন কোয়ান্টাম পার্টিকেলের ন্যায় অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত সব্যসাচী যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তন্ময়তা কাটতে কম্পিউটারটিকে পুনরায় স্বস্থানে দেখে তিনি স্বস্তিলাভ করলেন। ক্রমাগত এই জাতীয় ঘটনার আকস্মিকতায় সব্যসাচী ভাবলেন তিনি বোধহয় পাগল হয়ে যাবেন।

আর একদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে সব্যসাচী বলেন—"হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে স্পন্দন এবং জ্বলনের কারণে। মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড উত্তাপ শরীরের বিভিন্ন অংশের কোষগুলিকে দহন করে ভস্ম করে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ ওইভাবে থাকার পর ওই জ্বলন এবং স্পন্দন ক্রমে আপনা থেকেই কমে গেল। পরবর্তীকালে ভারতীয় বৈষ্ণব, শৈব, রামায়েৎ প্রভৃতি সাধক, সন্ন্যাসীদের শরীরে ভস্ম এবং চন্দনের প্রলেপ, তিলক, ফোঁটা ইত্যাদি চিহ্নিত স্থানগুলির ও হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন চক্র বা গ্রন্থিগুলির অবস্থানের সঙ্গে নিজের শরীরের অভিজ্ঞতার, অনুভবের সাদৃশ্য বা মিল পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।"

ওই সময় প্রায়শই তিনি লক্ষ্য করতেন যে তাঁর গলার সম্মুখভাগ গোলাকার ভাবে নীল হয়ে ফুলে উঠত। এখনও নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকতায় এবং ঘটনাক্রমে তাঁর গলা নীল হয়ে ফুলে ওঠে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সব্যসাচী তাঁর নিজের শরীর দেখিয়ে বলেন—"সংস্কারমুক্ত এই শরীর নতুন বা পুরাতন কোনও সংস্কারকেই আর মেনে নিতে পারে না, তাই কোনও সংস্কার যদি

এই শরীরে প্রবেশ করতে চায় শরীর প্রবলভাবে প্রতিরোধ করে সে প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে। গলা নীল হয়ে ফুলে ওঠা ওই প্রবল প্রতিরোধেরই ইঙ্গিত।"

ওই সময় সব্যসাচী ঘন ঘন সমাধিস্থ হতেন। একদিন সূর্যমুখী ফুলের দিকে তাকিয়ে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গের চাপড়ামারি অরণ্যে গভীর বনানীর দিকে তাকিয়ে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন (সঙ্গের বন্ধুরা সেই সমাধিস্থ অবস্থার ভিডিও রেকর্ডিং করে রেখেছেন)।

অর্ধবাহ্য দশায় দিব্যদর্শনের (vision in trance) মাধ্যমে সব্যসাচী ভগবান বিনায়কের দর্শন পেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপারটা অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হলেও তার কাছে এই দর্শন বাস্তব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল। সব্যসাচী বলেন যে, এই জাতীয় দর্শনের অনুভব, অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার একমাত্র তাৎপর্য হল, সাধক বুঝতে পারেন যে তিনি সংস্কারমুক্ত হয়ে সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছেন এবং এই সময়ে শরীরে যে বিরাট মহৎশক্তির আবির্ভাব হয় তার কাছে জাগতিক কামনা-বাসনা-যশ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, লোকমান্যতা একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ বোধ হয়, এর বাইরে এর আর কোনও তাৎপর্য নেই। যদিও ধার্মিক তথা আধ্যাত্মিক ব্যাপারীরা এই সমস্ত দর্শন, অভিজ্ঞতাসমূহকে ফলাও করে প্রচারের মাধ্যমে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন এবং খ্যাতি ও লোকমান্যতা বৃদ্ধির উদ্যোগ করেন।

সব্যসাচীর শরীরে ঘটে চলা এই জাতীয় বিপর্যয়, আন্দোলন, দর্শন প্রভৃতি প্রসঙ্গে তিনি দিনলিপিতে লেখেন—

"আমার দেহে যে সব আন্দোলন দেখা দিচ্ছে তা আমার ধারণার এতটা বহির্ভূত যে মনের জোরে এসব ঘটছে সে কথা আমি স্বীকার করতে পারছি না। এছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস মনের জোর বা মনের সাহায্যে এসব শরীরে আবির্ভাব ঘটানো কোনওভাবেই সম্ভব নয়। যেমন কোনও মহিলা শুধু চিন্তাভাবনা বা মনের জোরে গর্ভবতী হতে পারবেন না—অনেকটা সেই রকম।"

৪২ দিন ধরে তাঁর শরীরে ঘটে চলা ঘটনাপ্রবাহের কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা

বা ধারণা তাঁর পশ্চাৎপটে ছিল না। অর্থাৎ এসবে তাঁর কোনও হাত ছিল না বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তিনি ছিলেন সমস্ত ব্যাপারগুলোর দ্রষ্টা বা সাক্ষী।

'সতোরি' বা স্বল্পকালীন সমাধির মাধ্যমে এখনো উচ্চ চেতনার (অতিমানস চেতনা) বিভিন্ন স্তর তাঁর মধ্যে উন্মোচিত হলেও এবং তা তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করলেও স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আর ব্যাহত করে না। মানবাত্মার মঙ্গলসাধনের জন্য উচ্চতর চেতনার এই প্রকাশ যা তাঁর শরীরকে অবলম্বন করে এবং ক্রমাগত রূপান্তরিত করে বিশ্বের বুকে প্রকাশিত ও উন্মোচিত হয়ে চলেছে তা মাতৃপ্রকৃতির এক কখনোই শেষ-না-হওয়া প্রক্রিয়া, কারণ সমাজ-সংস্কৃতি-সংস্কারের জগতে শক্তির নব নব বিন্যাসে চেতনার এই ঊর্ধ্বায়ন মানবাত্মার মঙ্গলের জন্য অবশ্যম্ভাবী। যদিও সব্যসাচী চেতনার স্তরের অস্তিত্ব মানেন না। তাঁর মতে স্বপ্ন না ভাঙলে যা যেরকম সেটি ঠিক সেইরকমভাবে দেখা অসম্ভব এবং তিনি সর্বদাই জ্ঞানালোকপ্রাপ্তি, নির্বাণ, মোক্ষ, প্রেম, সমাজ সংস্কারের মহানতা প্রভৃতি বিষয়কে পুরোপুরি অস্বীকার করে থাকেন। তাঁর মতে, আমাদের পশ্চাৎপট এবং সংস্কার আমাদের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির ছন্দোময় অনুরণনের প্রতিবন্ধক। যদি ভাগ্যক্রমে অভিজ্ঞতার কাঠামো ভাঙতে শুরু করে তখন অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু এর কোনও তাৎপর্য নেই।

তাঁর জীবনের এই রূপান্তর প্রসঙ্গে সব্যসাচীর নিজের কথায়—''আমি আমার অন্তর্নিহিত শক্তির পঁচানব্বই শতাংশ ব্যয় করেছি গভীর আকাঙ্ক্ষা, নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরের খোঁজে আর পাঁচ শতাংশ ব্যয় করেছি পদার্থবিদ্যার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে, এই হল আমার নিজের জীবনের কাহিনি আর বিশ্বপ্রকৃতির এ ব্যাপারে কী ভূমিকা বা কার্য সে রহস্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আমরা এখনো বিন্দু-বিসর্গ জানি না, আর আমাদের বস্তুভিত্তিক সুখভোগের চাহিদার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধও নেই। অর্থাৎ আত্মতৃপ্তিজনিত সুখভোগের এবং তথাকথিত ধর্মগুরু বা ভণ্ড অধ্যাত্মবাদীদের আত্মশ্লাঘা ও ইন্দ্রিয় সুখভোগের বা বৈভবময় জীবনযাপনের চাতুরির সঙ্গে এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ সংগতিহীন ও সম্পর্কহীন। তাই এই রূপান্তরকে সামাজিক লেনদেনের বাজারে উপভোগের সামগ্রী করে তোলা

একেবারেই অসম্ভব।''

নব নব চেতনার উন্মেষ, ধারণাতীত বিষয়সমূহকে মানবের বোধগম্যতায় আনারই এক প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রক্রিয়া যা তার মধ্য দিয়ে গত দেড় দশক ধরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। প্রকৃতিপ্রদত্ত মানবশরীর চিন্তারাজির নিরবচ্ছিন্ন কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ভারহীন মুক্তজীবনের (যা তার স্বাভাবিক স্থিতি) অন্বেষণে যুগ যুগ ধরে যে ক্রন্দন করে চলেছে তার পরিসমাপ্তি ঘোষণার এবং প্রকৃতির সঙ্গে শরীরের ছন্দোময় সহাবস্থানের প্রয়োজনে যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা তার প্রতিষ্ঠার জন্য ও মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশের জন্য সব্যসাচীর জীবনে এর প্রকাশ যেন এক অন্তহীন পরিপূর্ণতালাভের যাত্রা।

সমস্ত রকমের কাম্য ও কামনা পূরণের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে—জ্ঞানালোকপ্রাপ্তি, মোক্ষ বা সম্বোধীলাভের পথযাত্রীরা এই প্রচ্ছন্ন ঋষি সব্যসাচীর সংস্পর্শে এলে বুঝতে পারেন যে বাইরে থেকে কোনও আগুন দেখতে পাওয়া না গেলেও এই বাহ্যাড়ম্বরশূন্য শুদ্ধ মানুষটির সঙ্গ করলে এর প্রচণ্ড দাহিকাশক্তি কীভাবে তাদের পুড়িয়ে দেয়, সমস্ত আভ্যন্তরীণ সংস্কার দহন করে শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত মানবে পরিণত করে। সব্যসাচী বলেন—মোক্ষ, মুক্তি, শুদ্ধ, বুদ্ধ—মানুষের এই সমস্ত ধারণাসমূহ মনোময় জগতের ব্যাপার, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকে ও থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের মুমুক্ষা শরীরের গভীর আভ্যন্তরীণ সংবেদন, সম্পূর্ণ শারীরিক চাহিদা। গভীরে এই চাহিদার অনুরণন হলে, সংবেদন জেগে উঠলে মানুষের অন্বেষণ শুরু হয়। এর জন্য প্রয়োজন সততা, নিষ্ঠা ও অসীম সাহসের। এর ফলে শরীরে সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব শক্তির ভারসাম্য—তখন, একমাত্র তখনই জীবনে প্রকৃতিপ্রদত্ত শৃঙ্খলার পুনর্জন্ম ও পুনর্বিন্যাস ঘটতে পারে।

প্রান্তরেখার দিক্‌চক্রবালে উদীয়মান সূর্যের আলোর ছটা যেমন তমসাকে ভেদ করে জগতের বুকে আলোর বন্যা বইয়ে দেয়, জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত সব্যসাচীর জ্ঞান ও প্রেমের আলো তেমনি বর্তমান বিশ্বের সমাজব্যবস্থায় সংস্কৃতি-সংস্কারের চাপে হতাশ, উদভ্রান্ত, দিশাহীন মানবাত্মার মধ্যে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের পর বর্ষার বারিধারায় ধরিত্রীর বুকে বয়ে আনা শীতলতার

স্পর্শের মতন উন্নত চেতনাসমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির আঙ্গিকে ভারহীন মুক্তমানবের চিন্তাধারা, যা মাতৃপ্রকৃতির দিব্য আশীর্বাদ স্বরূপ—সেটা এই সমস্ত জাগতিক কামনাবাসনা মুক্ত, শুদ্ধ-সাত্ত্বিক, স্বল্পাহারী, সদহাস্যময়, অলৌকিক প্রাণশক্তিতে ভরপুর, বর্তমানে স্বেচ্ছাবসরপ্রাপ্ত সব্যসাচীর সংস্পর্শে আসা মানুষেরা তাঁর জ্ঞানের ও প্রেমের স্পর্শে সর্বদাই অনুভব করছেন।

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
রথযাত্রা, ৬ আষাঢ়, ১৪১৯

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

ড. সব্যসাচী গুহ, আমাদের প্রদীপদা,—নামটার সঙ্গে কীভাবে কবে যে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়লাম তা নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি আজও। এই মানুষটির কথা ভাবলে কিংবা তাঁর সামনে উপস্থিত হলে আমার মনে হয়, একটা বিশাল বটবৃক্ষের স্নেহের ছায়ায় আমি একটা চারাগাছের মতো ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছি। সে ছায়ায় না আছে ভণ্ডামি, না আছে সংস্কার, না আছে অস্তিত্বহীন কিছু পাইয়ে দেওয়ার মিথ্যা আশ্বাস। আছে যুক্তি দিয়ে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সবকিছুকে আত্মস্থ ও উপলব্ধি করার অমোঘ সঞ্জীবনী মন্ত্র।

ড. সব্যসাচী গুহর সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ করার সময়েও আমার মনের মধ্যে ছিল অনেক দ্বিধা, অনেক দ্বন্দ্বের প্রবল উপস্থিতি। কিন্তু জানি না কিসের টানে বারবার ছুটে যাই, উদ্গ্রীব হয়ে থাকি, তাঁর সান্নিধ্য লাভের লোভে।

অধুনা আমেরিকানিবাসী ড. গুহ আক্ষরিক অর্থেই যাযাবরের মতো পরিভ্রমণ করে চলেছেন বিশ্ব জুড়ে। আর এই ভ্রমণকালে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনায় দিয়েছেন তাঁদের নানাবিধ প্রশ্নের জবাব, জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর। কথোপকথনে কেটে গিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁর এই অমূল্য কথামালাকে শব্দধারক যন্ত্রে (ভয়েস রেকর্ডারে) ধরে রেখে, পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণী বা উক্তি এক জায়গায় সংকলিত করে, ''পরিপূর্ণ আস্থা'' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ করেন শ্রীমতি গোল্ডা মার্কোভিক (যদিও যাঁর সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলা হচ্ছে, সেই ড. সব্যসাচী গুহর এই 'বাণী' শব্দটিতে তীব্র আপত্তি থাকবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তিনি বলেন, তিনি 'গুরু'ও নন, আর কারও উদ্দেশ্যে কোনও 'বাণী'ও প্রচার করেন না। তবু আমার সীমিত বাংলা শব্দভাণ্ডার ঘেঁটে এর থেকে ভালো শব্দ আর কিছু পেলাম না বলে ওই শব্দটিকেই বেছে নিলাম)। অবশেষে অগ্রজপ্রতিম, ড. গুহর বাল্যবন্ধু, শ্রী রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সুচারুরূপে সেরে ফেলেছেন ''পরিপূর্ণ আস্থা''

বইটির অধিকাংশ উক্তির বঙ্গানুবাদ এবং ড. গুহর অন্যান্য পুস্তক ও চিঠিপত্র থেকে তার কিছু উক্তি ও কবিতা সংকলিত করে আমাদের হাতে সেটিকে পুস্তকাকারে তুলে দিতে চলেছেন অনতিবিলম্বেই। আমি নিশ্চিত এই বইটি সকলের ভালো লাগবে, স্পর্শ করবে হৃদয়, হয়ে উঠবে মনোগ্রাহী।

ড. গুহর সব কথা বোঝবার মতো জ্ঞান হয়তো আমার নেই, তবে তাঁর কথার এবং লেখা পুস্তকের আরো গভীরে প্রবেশ করার এক অবিরাম সংগ্রাম আমি চালিয়ে যাচ্ছি নিরন্তর। এই বইটি যিনি একবার ভালো করে পড়বেন, আমার ধারণা, তিনি কিছুটা হলেও নিজেকে পরিবর্তিতরূপে দেখতে পাবেন।

সবশেষে, একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। বারবার 'দাদা'র কাছে (আর ড. গুহ না বলে 'দাদা' শব্দটা ব্যবহার করলাম) ছুটে গেছি নিজের কোনও সমস্যার কথা বলব বলে। বলতে পারিনি। ওই মানুষটার সামনে কিছুক্ষণ বসলেই কিংবা দূরভাষে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলেই মনে হয়, আমার তো কোনও সমস্যা নেই। কি সব যেন বলব বলে ভাবছিলাম? বড্ড ছেলেমানুষী হয়ে গেছে।

এই রকমই একদিন সকালে 'দাদা'-র কাছে দৌড়ে গেলাম। মনের মধ্যে চূড়ান্ত অস্থিরতা। সঠিকভাবে জানি না কী কী আমার সমস্যা। অক্সিজেনের অভাবে যেরকম শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, আমার তখন ঠিক সেইরকম দমবন্ধ করা অবস্থাই হয়েছিল। ওইরকম একটা চরম অস্বস্তিকর অবস্থায় 'দাদা'র সামনে পৌঁছলে, আমার সঙ্গে দু-চারটে মামুলি কথা বললেন। তারপর সামনের সোফায় চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। আমি 'দাদা'র দিকে তাকিয়ে বসে আছি। ভাবছি কিছু বলবেন বোধহয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি আমার ওই প্রচণ্ড অস্বস্তিটা হঠাৎ ম্যাজিকের মতো পুরোপুরি হারিয়ে ফেললাম। 'দাদা'র চোখ তখনও বন্ধ। মনে মনে ভাবছিলাম, অক্সিজেনের সিলিন্ডার এবং নাকে নল ছাড়াই এত অক্সিজেন আমি পেলাম কি করে? আসলে অক্সিজেনের বিশাল ভাণ্ডার, উৎসটি তো আমার সামনে বসে। তারপরেই চোখ খুলে বললেন, ''আমার একটা কাজ আছে। চলো বেড়িয়ে পড়ি এবার।''

দৈনন্দিন জীবনে চলতে চলতে, 'দাদা'র একটা কথাই বারবার মনে

পড়ে—''তোমার সমস্যার কারণ যদি তুমি জান, তবে তার সমাধানের চাবি তোমার হাতেই আছে। বসে না থেকে নিজের করণীয় কাজটা খুব মন দিয়ে কর।"

দাদা, তোমার কথা যেটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি, তা-ই আমার বাস্তব জীবনে চলার পথের পাথেয়। বারবার শুধু এটাই মনে হয়, 'দাদা'কে পুরোপুরি বুঝতে পারছি না। সত্যিই বড় কঠিন তোমায় বোঝা।

আমার ইচ্ছে করে, আমার পরিচিত সকল মানুষজনকে ড. সব্যসাচী গুহর সম্মুখে উপস্থিত করি। সেটা করতে পারলে আমারও ভালো লাগত আর একটু-একটু করে হলেও তাঁরা তাঁদের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার বেড়া ভেঙে ফেলে প্রকৃত বাস্তব-এর মুখোমুখি হতে পারতেন। ড. গুহর কথা শুনলে নির্মম সত্য, কঠোর বাস্তবকেও মোকাবিলা করা যায় নির্ভয়ে, সাহসিকতার সঙ্গে। তাঁর প্রাণোচ্ছল উপস্থিতি আমাদের চোখের এবং মনের স্বচ্ছতাকে করে তোলে স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর। গঙ্গার নির্মল পরিবেশ যেমন মানুষের মনে বুলিয়ে দেয় শান্তির পরশ, তার শত-সহস্রগুণ বেশি শান্তি পাওয়া যায় ড. গুহর আনন্দঘন সাহচর্যে, অহৈতুকী ভালোবাসায়।

প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য্য
২৭ নভেম্বর, ২০১৪।
ভদ্রকালী, হুগলি।

পরিভ্রমণ

''প্রকৃতির কাছে মানুষের মানসিক চাহিদা একটা অত্যাচারের মত। তাই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পর সমস্ত চাহিদা মায়ার পরিণতি।"—

ড. সব্যসাচী গুহর উক্তিগুলো পাঠ করার পর একজন সচেতন পাঠকের মস্তিষ্কে আলোড়ন তুলবেই।

মানুষ যখন আশা-নিরাশার জালে বন্দি, জীবনের কোনও কূল-কিনারা খুঁজে পায় না, অন্তর্দ্বন্দ্বে বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, অস্থির চিত্তকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, তখনই মানুষ নিস্কৃতি পেতে চায় সেই জরাজীর্ণ জীবন থেকে।

এমন সময়েই পাঠককে এক নতুন স্বাদ পেতে সাহায্য করবে ড. গুহর উক্তি।

দৈনন্দিন সমস্যায় পড়া মানুষের দুর্বল মুহূর্তের সুযোগই নেয় সেইসব সাধুসন্ত যারা মানুষকে ভুলপথে চালিত করে। নিজের মতকে চাপিয়ে দেয় তাদের উপর।

পরিবেষ্টিত মানুষের মাঝে বলা কথাগুলোকে সংগ্রহ করেই উৎসারিত আলোর সৃষ্টি। যেখানে তিনি ধর্মীয় আশার কল্পকাহিনির কথা বলেন।

ড. গুহর উক্তিতে যে সত্যটা সহজেই পাওয়া যায় তা হল—

কোনও জাদুতেই আমাদের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সব সমস্যার সমাধান আমাদের নিজেকেই করতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে যেকোন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মানুষ এটা করতে পারবেন।

মানুষ তার চিন্তায় নিয়ে আসেন ঈশ্বরকে। সেখানেও মাথা নোয়াবার চেষ্টা করেন। যা নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার এক অভিনব প্রয়াস। কালো-মেঘমুক্ত জীবন ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টা ফুটো পাত্রে জল ঢেলে তৃষ্ণা মেটাবারই নামান্তর।

তাই বারে বারে ফিরে আসতে হবে পাঠককে ড. গুহর উক্তিতে।

সংগীতা চক্রবর্তী
৭ নভেম্বর, ২০১৫।
জলপাইগুড়ি।

প্রাক্‌কথন

ড. সব্যসাচী গুহ, একদা পদার্থবিদ এবং প্রথিতযশা গবেষক—আজকের সমাজ আরোপিত তথাকথিত উপাধিহীন, পরিচয়হীন ভ্রাম্যমান এক অস্তিত্বমাত্র।

ড. গুহ কবি নন, সাধক নন—সমাজ আরোপিত কোনও উপাধি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁর লেখনীপ্রসূত কবিতা এবং মুখনিঃসৃত বাণীমালা নিয়ে সংকলিত ছোট্ট গ্রন্থ ''উৎসারিত আলো''।

গ্রন্থ লেখা হয় পাঠকের মন জয় করার জন্য। পাঠকের মনোরাজ্যে শাশ্বত আসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক লেখক, কবি সদা তৎপর। এও খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের এক প্রতিযোগিতার বাজার।

কিন্তু ড. গুহর রচনার মধ্যে কোথাও পাঠকসমাজ তৈরির কোনও চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় না। বাস্তবে এই গ্রন্থ প্রকাশ বা অপ্রকাশে তাঁর নিজস্ব বিনিয়োগ শূন্য। শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গকামী সৎ, নিষ্ঠাবান কিছু ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল এই গ্রন্থ।

গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি তাঁর কথামালা; যা বারংবার গ্রথিত হয় বিভিন্ন ভাবে ও ভঙ্গিমায় তাঁর বন্ধুবর্গের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপচারিতার মাধ্যমে। এই আলাপচারিতার কোনও আনুষ্ঠানিকতা বা আড়ম্বর নেই, এই আলাপচারিতা স্বতঃস্ফূর্ত।

দ্বিতীয় ভাগ তাঁর কবিতাসমূহ। যেগুলির কাব্যমূল্য নির্ধারণ করতে যাওয়া বাতুলতামাত্র। 'আমিত্ব' হারানোর প্রাক্‌ক্রন্দন—জীবনের প্রাকৃতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে পরাজিত অহং-এর লুপ্তপ্রায় হাহাকার—দেহের মধ্যে ঘটমান জীবনঝঞ্ঝার মত্তলীলার কাব্য—যার সাহিত্যের বা আধ্যাত্মিকতার সামাজিক বাজারে মূল্য শূন্য;—কিন্তু বোধ্য তাঁর কাছেই, যিনি এজাতীয় অন্তঃসংগ্রামের সাক্ষী—অনেকটা পদার্থবিদ্যার অজড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রজাত অলীক বলের মতো।

আলাপচারিতা থেকে নেওয়া কথাসম্ভার ড. গুহর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু এই কথামালার মধ্যে নেই কোনও ধর্মীয়বার্তা, নেই কোনও অলীক, মহান ঐক্যের স্বপ্ন বা সোনার পাথরবাটিসম আধ্যাত্মিক শান্তির মিথ্যা আশ্বাস। যা আছে, তা হল জীবনের হাতে মানুষের নামরূপাত্মক অস্তিত্বের নিঃসহায়তার বার্তা, যে নিঃসহায়তার বিকৃত বহিঃপ্রকাশ মানুষের সর্বগ্রাসী অহং, যা দিয়ে সে জগৎ শাসন করার ভ্রান্ত চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এই অসহ্য অত্যাচার সয়েও জীবনের গতি নিস্তব্ধ, তীব্র—যা প্রতিমুহূর্তে কাজ করে চলেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে—যার কাছে মানবসৃষ্ট সমাজ আরোপিত অহং-এর বাজারী সভ্যতা শিশুর খেলনার মতো ঠুনকো।

যে জীবনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে ড. গুহর কথায় ও কাব্যে তা প্রাপ্য নয়, বোধ্য নয়, জ্ঞেয় নয়; যার কোনও মাত্রা নেই, কাল নেই—যা জীবনপ্রবাহের এক ব্যতিক্রমী বহিঃপ্রকাশমাত্র—যার কোনও নির্দেশতন্ত্র নেই—কিন্তু যে বহিঃপ্রকাশ স্বতঃই জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্দেশতন্ত্র রূপে।

ড. পার্থকৃষ্ণ ঘোষ

জীবনের কাছে হয়তো 'সত্য' বলে কিছু নেই। মানুষের জানার ও বোঝার আগ্রহের মধ্য দিয়েই চিন্তা জগতে 'সত্য' বলে একটা জিনিস তৈরী হয়েছে, এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা পরিবর্তনশীল।

মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতার মধ্য দিয়েই মনোজগতে প্রকৃতির থেকে বিভাজন বোধের আবির্ভাব ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন ভয়েরও সৃষ্টি হয়। এই ভয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার যাবতীয় প্রচেষ্টার পরিণতি হল আরো জটিল চিন্তা।

চিন্তার মধ্য দিয়েই মানুষের মনের মধ্যে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারনার জন্ম হয়, তার নাম হল সময়।

চিন্তালব্ধ উপসংহার পরিবর্তনশীল এবং অনিত্য। আজ যা মানুষের কাছে পরম সত্য বলে প্রতিয়মান হচ্ছে তা অতীতের বা বর্তমানের কোনও একজনের বা সমষ্টিগত চিন্তার মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছে। পরবর্তীকালে তা সত্য বলে নির্ধারিত হবে কি না তা কেউই বলতে পারে না।

সমস্ত ধর্মীয় আশাসমূহ যা মহৎ জীবনের অঙ্গীকার করে বা উন্নত আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছনোর কথা বলে, এ সবই হল কল্পকাহিনি শ্রেণিভুক্ত, এদের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। কল্পনার জগতে 'আশা' সর্বদাই ক্রিয়া করে চলে। অহম বেঁচে থাকে কল্পনার জগতে আশার মাধ্যমে।

চিন্তা এবং প্রতিচ্ছবি নির্মাণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক বিচ্ছিন্ন সমান্তরাল অস্তিত্বের। এই দুটি অর্থাৎ চিন্তা এবং মানসিক প্রতিচ্ছবি এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করেছে যা জীবনের সঙ্গে সংযোগকারী উদ্দীপনা ও সাড়া ব্যতিরেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। তুমি এখানে বসে একটা বই পড়তে পার এবং কল্পনায় সৃষ্টি করতে পার যেন তুমি সেখানেই আছ। জীবনের বিস্তারে, বাস্তবে, তার কোনও অস্তিত্বই নেই—কিন্তু যেভাবেই হোক তুমি সেই চিন্তায় এবং প্রতিচ্ছবি নির্মাণে সাড়া দিচ্ছ। তোমার

বিরামহীন সাড়া সৃষ্টি করেছে আরও আরও প্রতিস্পন্দনের চাহিদা। এখন যেটা হচ্ছে সেটা হল যে, তোমার মধ্যে এরূপ প্রতিস্পন্দনের চাহিদা প্রয়োজনের তুলনায় অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তোমার চিন্তার জগৎ, যা কিনা তোমার কল্পনার জগৎ-এর এক সৃষ্টি. যদি তা কোনওক্রমে কোনও কিছুকে সমর্থন না করে, তাহলে এই চাহিদা বৃদ্ধি লাভ করতে পারে না এবং ধীরে ধীরে থেমে যেতে শুরু করে।

মঙ্গল বা কল্যাণের সমর্থনে আর কি থাকতে পারে যা চিন্তাসমূহ এবং প্রতিচ্ছবিসমূহের জগতে নেই? চিন্তার সমর্থন ব্যতীত এমন কোন কল্যাণ বা মঙ্গল সেখানে আছে কি? চিন্তার পরিণাম হল কেবল শব্দ, ঠিক? শরীর এ সমস্ত জিনিসকে পাত্তা দেয় না। সে শুধু ফিরে পেতে চায় চাপ (উৎকণ্ঠা) হীন পরিস্থিতি বা অবস্থা—যতদূর সেটা সম্ভব। চিন্তালব্ধ কোনও সমর্থনকে শরীর পাত্তা দেয় না। দৈবাৎ যদি উদ্বিগ্ন চিন্তা দ্বারা মীমাংসার বিফলতা তোমার কাছে প্রত্যক্ষ হয় তা হলে হঠাৎ তোমার শক্তি যা নাকি ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্নভাবে অপব্যায়িত হচ্ছিল তা আর অধিককাল অপব্যায়িত হতে পারবে না। একটা ভিন্ন প্রক্রিয়া উন্মোচিত হতে শুরু করবে। তোমার শরীরের আভ্যন্তরীণ বিন্যাসে আমূল এক মহা পরিবর্তন সূচিত হবে। ওই স্তরে তোমার মানসিক চাপ বা উৎকণ্ঠা খুবই কমে আসবে এবং পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এর সুবিন্যাসকে প্রতিষ্ঠা করে এর যাত্রাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে শরীর কাজ করতে শুরু করবে। এক নির্দিষ্ট অবস্থায় যা অজ্ঞাত, দেহের ভারসাম্য এবং বিকাশ সুবিন্যাসের আওতায় এসে পড়বে, অবিন্যাস আর মাথাচাড়া দিতে পারবে না, দেহ তার মঙ্গল এবং শান্তিময় সহাবস্থানের জন্য শক্তিময় ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করবে। এর সংকেত হল শরীরের গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়াকর্মের সুসংহত পরিবর্তন এবং সমস্ত ব্যাপারই এক আলাদা বিন্যাসে কাজ করতে শুরু করা। চিন্তাপ্রসূত তার্কিক সমর্থনের এর আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না।

জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এতই সীমিত যে আমরা সেই জ্ঞানের উপযোগে ভবিষ্যত কোনওদিন জানতে পারব না। মানুষের ভয়

ব্যাপারটাই এসব জড়িয়ে। আমরা ভবিষ্যৎ জানতে চাই, কারণ আমরা কাল্পনিক ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারি বলে। আমাদের অজানা ভবিষ্যৎ যে ভয়ের সৃষ্টি করে, তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমরা এক অসাধারণ চাহিদার সৃষ্টি করেছি। এই চাহিদা থেকেই ধর্মযাজক, রাজনৈতিক নেতা, জ্যোতিষী, সাইক্রিয়াটিস্ট এবং ভগবানের সৃষ্টি। মানুষের জ্ঞান কোনওদিন এ সমস্যার মূলে পৌঁছতে পারবে না।

আমরা কোনও জিনিস উপলব্ধি করতে পারি তখনই যখন আমরা জ্ঞানের উপযোগ করি। আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি এই জ্ঞান সরবরাহ করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে কিছু নেই—আমাদের প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি ভাবনা অন্য কারোর কাছ থেকে জ্ঞানত বা অজান্তে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে শেখা, তাই নিজের বলে কিছু মনে করাটা হল নিজেকে ঠকিয়ে বাহবা নেওয়া।

যে মুহূর্তে তুমি কোনও কিছুকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কর—ধর, একটি চিন্তা—তুমি ওটার চর্যা করছ মানে, তাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় ওই চিন্তার জন্য শক্তি প্রয়োগ করছ। যে বিশেষ চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চাইছ, তাকেই তুমি সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করছ। এর সঙ্গে মোকাবিলা করার একটাই পথ আর তা হল তোমার সত্ত্বার উপর এর পূর্ণ-প্রতিক্রিয়া ঘটানো এবং এর গতিবিধি লক্ষ্য করা। হতাশ হও, অবসাদগ্রস্থ হও, বিষণ্ণ হও, তোমার শরীর এসব নিয়ন্ত্রণ করবে।

তোমার চিন্তাশীল মন বর্তমান কালে থাকতে পারে না—যে মুহূর্তে তুমি স্বীকার কর যে তুমি বর্তমানে আছ, তোমার স্বীকৃতিই তোমায় বর্তমান থেকে বিচ্যুত করে। বিদ্যমান জগতে থাকাকালীন জ্ঞানের উপযোগ না করলে তোমার আমিত্বের অস্তিত্ব থাকে না। নিরবচ্ছিন্নভাবে অতীতে প্রবেশ করা এবং সেই অতীত থেকে, যে ভবিষ্যতের কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নেই সেই ভবিষ্যতকে নির্মাণ করা—এটাই মনের প্রকৃতি। পুনরুদ্ধারযোগ্য

স্মৃতিভাণ্ডার যাকে বলি 'জ্ঞান' তা 'পছন্দ' বলে এক প্রক্রিয়ায় অস্তিত্বহীন ভবিষ্যৎকে চেতনায় প্রক্ষেপিত করে, 'ইচ্ছা' বলে এক সত্যকে ব্যবহার করার মাধ্যমে। মনের এই ক্রিয়াকর্মের মূলভিত্তিকে আমরা বলি 'আশা'। এই প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতায় মন আশাবাদী হয়ে সাময়িকভাবে চাপ বা উদ্বেগরহিত হবার প্রয়াস করে।

আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিদ্রহীন গ্রন্থিপুঞ্জ (ductless gland) পরস্পরের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ বজায় রাখে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক ঠিক নিউরনপুঞ্জে সঠিক মাত্রায় বিভিন্ন নিউরোট্রান্সমিটারের নিঃসরণ জারি রাখে। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে কি সম্বন্ধ হবে তা গভীরভাবে এইসব নিঃসরণের উপর নির্ভর করে। তাই এসব রাসায়নিক ভারসাম্যের উপর সরাসরি নির্ভর করে আমাদের মনের অবস্থা অর্থাৎ মানসিক সন্তোলন।

সংস্কৃতি কথাটার মানে হল ভেজাল—আমাদের এই বিবর্তিত দেহ নিপুণ যোগ্যতা ও অসাধারণ বুদ্ধি নিয়ে প্রকৃতিতে বিরাজ করছে। এর চাহিদা অত্যন্ত সীমিত, প্রকৃতপক্ষে অসীম শান্তির আধার এবং অতি নিরীহ। যখনই ওই ভেজাল আমাদের মধ্যে যুক্ত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ার্ত, হিংস্র, অস্থির, লোলুপ উটকো জিনিসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর এসব ঢেকে রাখার জন্য প্রেম, ভালোবাসা প্রভৃতি জিনিসের আবিষ্কার করা হয়। কোটি কোটি বছর ধরে তিলে তিলে এক অসাধারণ অতিসংবেদনশীল স্নায়ুবিন্যাসের উপযোগে প্রকৃতি এই গভীর শান্তিময় নিরীহ দেহটাকে বিবর্তনের এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সেই চরম অনুভূতিশীল দেহের অদ্ভূত ক্ষমতাকে সুখ ভোগের সামগ্রী করেছে এই ভেজাল। আর সুখ ভোগের শীর্ষে রাখা হয়েছে 'সমাধি' আর 'সচ্চিদানন্দ'কে।

আশাহীন কোনও কিছুকে গ্রহণ না করার ব্যাপারে আমরা গভীরভাবে প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত এবং অভ্যস্ত। এটাই আমাদের ভাবনাকে ভবিষ্যৎ

সৃষ্টি করতে এবং চিরস্থায়িত্ব প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে। চিন্তার গতিবিধি এক বিশেষ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রলম্বিত হয় এবং চিন্তার জগৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের উদ্যোগের পর উদ্যোগ সৃষ্টি করতে বাধ্য করে।

একটা নির্দিষ্ট আচরণবিধি যা সমাজ আরোপিত করেছে এবং যদি তুমি তা মেনে না চল, তবে তার পরিণামসমূহের মুখোমুখি তোমাকে হতেই হবে। ভালো-মন্দ জাতীয় অসংখ্য দ্বন্দ্ব তোমার মধ্যে থাকবে—তুমি বিদ্রোহী হতে পার, কিন্তু তুমি ফিরে আসতে প্ররোচিত হবে এবং সামাজিক প্রভাব তোমার মধ্যে কাজ করতে থাকবে—তুমি কত কাল ধরে বিদ্রোহ করবে সেটা কোনও ব্যাপার নয়। এই সমস্ত ব্যাপারের মোকাবিলা এবং নিষ্পত্তি তোমার নিজেকেই করতে হবে। এই ব্যাপারে অন্য কেউ তোমাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করতে পারে না। মনুষ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে যদি তোমার কিছু জ্ঞান থাকে, তুমি কখনও কোনওদিন অপর কাউকে সে পথে ঠেলে দিতে চেষ্টা করবে না, যে পথে চলাটা তুমি ভাবছ সঠিক।

এমন একটা পরিবেশ থাকা সম্ভব যার প্রভাব আমাদের মধ্যে জীববিজ্ঞানভিত্তিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করার অনুকূল, এমন একটা প্রকৃতি নির্ধারিত ক্ষেত্র—প্রবল শক্তিশালী ক্ষেত্র, যার দৃঢ় আভ্যন্তরীণ আন্দোলন অন্যান্য জীবের উপর মঙ্গলময় প্রভাব আনতে পারে। এটা সম্ভবপর হয় প্রাথমিকভাবে আমাদের শরীরে ছিদ্রবিহীন গ্রন্থিগুলিকে যথাযথভাবে কাজ করতে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে। যে চালিকাশক্তি আমাদের সাহায্য করে প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার, তার উৎস হল দেহের বিভিন্ন হরমোন এবং নিউরোট্রান্সমিটারের ঠিক ঠিক পরিমাণের উপস্থিতি এবং নিঃসরণ। এটাই হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। দেহ সবসময় এই সহাবস্থানের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের পরম শান্তির প্রবণতা হয়তো দেহের এই সুপ্ত ইচ্ছারই একটা প্রতিফলন। কিন্তু মনের গতিবিধি আমাদের এই অবস্থা থেকে সবসময় দূরে সরে থাকতে বাধ্য করে। মনস্কামনা এমনই একটা জিনিস—এমনকী সুখশান্তিতে থাকার মানসিক চাহিদাও এই ভারসাম্য থেকে

আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়। অথচ দেহ তার ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে মনের অজ্ঞাতে সামগ্রিকভাবে এই অবস্থায় যাওয়ার জন্য ব্যাকুল।

সমাজ আমাদের যে অবস্থায় মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথ নেই। প্রকৃতপক্ষে আমরা কী চাই? এমন কোনও চাহিদা আছে কি যা আমি আমার মৌলিক চাহিদা বলে মনে করতে পারি? এমনকী ঈশ্বর লাভের চাহিদাও সমাজ আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সমাজ যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নানা রকম প্রতিকৃতি সৃষ্টি করেছে, আর আমাদের বাধ্য করেছে সেইসব বীরদের পূজা করতে। মহাপুরুষ, বীরদের পূজা করে তাঁদের মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে গভীর দুঃখ ও হতাশার। অন্যের মতো হওয়া মরীচিকার পেছনে ছোটার মতন, যার কোনও অস্তিত্ব নেই, কাল্পনিক কুহেলিকা মাত্র, তাকে বাস্তবায়িত করার বিফল প্রয়াসের মতন।

আশার কখনও মৃত্যু হয় না। তুমি এখনও আশা কর যে তোমার নিজস্ব কোনও জ্ঞান বা প্রচেষ্টা অথবা অপর কোনও ব্যক্তির প্রজ্ঞাযুক্ত উপদেশ তোমাকে এই অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ থেকে বার করে আনবে। আমায় বিশ্বাস কর—এটা হবার নয়।

তুমি যা করতে চাও, প্রকৃতপক্ষে তোমার পারিপার্শ্বিক প্রভাব তোমাকে যা কিছু ভাল-মন্দ বলে শনাক্ত করে বোঝাতে বাধ্য করেছে শুধু তাই। এটা একটা সামাজিক প্রভাব এবং তোমার সারাজীবন ব্যয় হয়েছে ক্রমাগত এটা অনুসন্ধান করতে যে তোমার নির্দ্বিধায় কী করণীয় ছিল—এ এক কখনই শেষ না হওয়া কর্মসূচি। প্রকৃতপক্ষে 'তুমি' এসব সমস্যাকে বাঁচিয়ে রাখার মূল। তুমি কিছুতেই বুঝতে পার না যে তোমার চিন্তা কখনই এসব জিনিস সমাধান করতে পারে না। তবু তুমি সবসময় তোমার চিন্তার যান্ত্রিক ক্রিয়াফলকে ব্যবহার করে চলেছ। তুমি বুঝতে চাও—তুমি তোমার সমস্যার সমাধান করতে চাও, কিন্তু তোমার চিন্তা তোমাকে সমাধান দেবে না এবং এর (চিন্তার)

তাৎক্ষণিক কৃতকার্যতা হল 'আশা'। এই সব ধারণার সঙ্গে চিন্তা এবং চিন্তক সবসময় সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে যা কিছু সৃষ্টি হবে তা হল সামাজিক প্রভাব, এর বাইরে কিছু নেই। এর থেকে বের হওয়ার কোনও পথ নেই, যদি দৈবক্রমে এ জ্ঞান বোধে বোধ হয় তখন তুমি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না—'আমি কী করব?' এবং কাউকে উপদেশ দেবে না তার কী করণীয়।

প্রকৃতি পরিকল্পিত সামঞ্জস্য যদি দৈববশে কোনও ব্যক্তির দেহের অভ্যন্তরে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থিপুঞ্জ ঠিকঠাক যেভাবে যে বয়সে ক্রিয়াশীল হওয়ার কথা সেভাবে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে তাহলে সেই দেহে এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে মনে হবে সেই ব্যক্তির জীবনে যেন কোনও অভিনব সত্তার অবতরণ হয়েছে, যার প্রত্যক্ষ ফল হল সেই ব্যক্তির মধ্যে অসাধারণ শক্তিশালী ক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটা।

আমাদের সবার মধ্যে একটা দেহভিত্তিক চাহিদা আছে—সম্পূর্ণ বিকাশের চাহিদা—একটা গভীর স্রোত বাধাহীনভাবে বয়ে চলার প্রয়াস করছে, আর সামাজিক মূল্যবোধের কাঠামো তাকে ক্রমাগত রুখে দেওয়ার প্রয়াস করছে—এই বাধাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা, এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হওয়ার চাহিদার প্রকাশ—গভীর হতাশা। এর উৎস আমরা বুঝতে পারি না, বুঝতে চাই না—আমাদের শুধু মনে হয় ইচ্ছাপূরণ করতে না পারার জন্যই আমাদের এ অবস্থা অর্থাৎ হতাশার জন্ম। আমরা একে এড়িয়ে চলার জন্য নিত্যনতুন কর্মকাণ্ড আবিষ্কার করে চলেছি, অথচ এই সমস্ত কর্মপ্রয়াস সামাজিক মূল্যবোধেরই নবতম সংস্করণ।

যখন তুমি কোনও বিষয়ে চিন্তা করতে থাক, তখন ব্যাপারটা সহজ হয় যদি বহু লোকের মেনে নেওয়া ধারণার সঙ্গে তোমার ধারণার সামঞ্জস্য থাকে। যদি দুই ধারণার মধ্যে গভীর দ্বন্দ্ব থাকে এবং তোমার পক্ষে ব্যাপারটা মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়, তখন কী হয়? এই মতানৈক্য দ্বন্দ্বের কারণ অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন প্রভূত শক্তি, সাহস এবং ন্যায় ও সততায় প্রবল

নিষ্ঠা। সেটাই গভীর কার্যকরী এবং জ্বলন্ত বিবেকবোধ লাভের একমাত্র পথ।

এই জগৎটা হল ঠিক এখন যে রকম দেখছ ঠিক সেইরকম—এটাই সব। যা-ই কিছু আমরা করি না কেন সবই হল এই জাতীয় ক্রিয়াকর্মের বিস্তার বিশেষ। এমন কোনও স্তর বা রাজ্য এর বাইরে নেই—এমন কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই যা নাকি এর অধিক কিছু। যে অতীত তোমার পশ্চাতে পড়ে আছে সেটা ঠিক এরকমই কিছু মাত্র ছিল, অন্যকিছু নয়—বাকি সব মিথ্যা কল্পনা। সেই কাল্পনিক স্তরের ব্যাপারে যখনই তুমি আনন্দ অনুভব কর তোমার অস্তিত্ব বর্তমান থেকে চ্যুত হয়, সেটাই মায়া। আমি কি বলছি সেটা বোঝার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে আমার বাক্যপ্রবাহকে তুমি তোমার মধ্যে ছিন্ন কর এবং মায়ার জগতে প্রবেশ কর। কারণ তোমার কল্পনার জগৎ তোমার জীবনের সঙ্গে এইভাবেই সংযুক্ত হয়ে আছে। সেটাই হল সমস্যা।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয় যখন ভারসাম্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের প্রকাশ দেখতে পায় বা তার সন্ধান খুঁজে পায় তখন আমাদের অভ্যন্তরে সংবেদন জেগে ওঠে। মুশকিল হল এই সংবেদন চেতন মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া জাগাবে সে ব্যাপারে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। আমাদের চেতনা আমাদের দেহের এক অতি সীমিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়, তাই আমাদের মধ্যে এমন অনেককিছু ঘটা সম্ভব চেতন মন যার কোনও হদিশ খুঁজে পায় না। অবশ্য এসব সংবেদনের পরবর্তী আঘাত এবং প্রত্যাঘাত চেতনার স্তরে উঠে এলেও আসতে পারে। চেতন স্তরে উঠে না এলেও তার মানে এই নয় যে আমাদের মধ্যে কোনও সংবেদন জাগেনি।

মহাপুরুষ, মহামায়া বা পরম চালক—জীবনের নিগূঢ় একটা প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য কাল্পনিক এক কাঠামো মাত্র। সেই নিগূঢ় প্রক্রিয়া যা আমাদের মধ্যে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য আনতে সাহায্য করতে পারে। যা এমন এক ভারসাম্য বজায় রাখবে যার প্রবল আরোপ আমাদের মধ্যে আর কোনওদিন বাসনার কাল্পনিক পাখনার সহযোগে মায়ার জগৎ সৃষ্টি করতে

পারবে না। সে প্রক্রিয়ার বীজ আমাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে। সুপ্তি ভাঙানো—মুমুক্ষা দেহেরই চাহিদা।

কোনও মানবীয় ধারণাই জীবনকে হুবহু অনুসরণ করতে পারে না। জীবন সম্বন্ধে কোনও বোঝাপড়াই জীবনের মিথোজীবিত্বের সঙ্গে (symbiosis) মেলবন্ধন ঘটাতে অপারগ। যে জীবন নিজেকে সৃষ্টি করেছে এবং তার ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে আমাদের পক্ষে তাকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা অসম্ভব। নিজেকে রক্ষা করার এক সাধারণ উপজাত বস্তু হল আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি—সেটাই হল মস্ত সমস্যা। আমরা সর্বদাই জীবনচক্রের একটা অংশ বুঝতে পারব, সমগ্রকে ধারণা করা অসম্ভব।

আমরা জানি যে দেহের বিভিন্ন অংশের কাজকর্মের ফলাফল বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি জাগায়। এই অনুভূতি যখন অতীত জ্ঞানের মাধ্যমে চেতনার জগতে অনুবাদ করার চেষ্টা করে, তখন স্মৃতি যে প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল এবং যে সমস্ত উপকরণ ও বাহ্যিক সংঘাতের ফলে সেই স্মৃতিসম্ভার গঠিত তার উপর নির্ভর করে অনুবাদের রূপটি কী হবে। যেহেতু প্রতিটি জীবনে স্মৃতিসম্ভার এবং বাহ্যিক সংঘাতের রাস্তা অত্যন্ত ভিন্ন, সেহেতু একই ধরনের সংবেদনের অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ হওয়াটা স্বাভাবিক। বহিঃপ্রকাশ যাই হোক না কেন, এক উন্নত স্তরের সাংগঠনিক অস্তিত্বের প্রভাব—প্রকৃতির গভীর পরিকল্পনাজাত সংগঠনের আরোপে যে তেজ ও বীর্যের সৃষ্টি হয় তা অন্য সমস্ত জীবের উপর সার্বভৌম মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে।

জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষে যেমন এই সংবাদ মজুদ থাকে যে প্রথম বিভাজনের বারো-চোদ্দো বছর পরে নতুন রসধারার নিঃসরণে দেহ-মনে ঝড় আসবে, অভিসারের সরঞ্জাম আপনা-আপনি তৈরি হবে---ঠিক সে রকম আর এক মহামিলনের প্রকাশ---

মুমুক্ষা, যা দেহের গভীর অভ্যন্তরে ঘটাবে বৈপ্লবিক রূপান্তর---মহামিলনের উত্তেজনায় সৃষ্টি হয় তাপস—অসাধারণ তাপস। এই তাপসের জন্ম থেকে মহাযোগের পূর্বমুহূর্তের ব্যাপ্তির নামই তপস্যা। যে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং আভ্যন্তরীণ তাপকে সমস্ত কামনা, বাসনা এবং ভীতি উপেক্ষা করে কাজে লাগাতে পারে সেই সার্থক তপস্বী।

মনুষ্যজাতিকে সঠিক পথে রাখার জন্য তুমি কি কোনও যুদ্ধ চালাতে যাচ্ছ? সঠিক পথটি কী? তুমি কি জান সেই পথ যা কার্যকরী হয়েছে? প্রকৃতপক্ষে সর্বজনবিদিত কোনও পথ নেই। কোনও যুক্তি সেখানে কাজ করে না—একটাও না। তুমি কোনও ব্যবস্থার স্বপক্ষে যেতে পার না, যতক্ষণ না তুমি তোমার মগজ ধোলাই করে এটা বিশ্বাস করতে শুরু করছ যে একটা বিশেষ ব্যবস্থাই সঠিক সমাজব্যবস্থা এবং সেখানে যাওয়ার একটা পথই সঠিক পথ। যদি এবং যখন তুমি এটা কর, তুমি নানা পথের সৃষ্টিকারী ঠিক সেই প্রাচীন রক্ষাকর্তাসমূহে পরিণত হও যাদের কোনও পথই তোমার জীবনে কার্যকরী হয় না। যদি তা না হত, তবে তুমি এটা পাঠ করতে না।

সামাজিক শক্তির বহুকালব্যাপী প্রভাব মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক প্রবল ভরবেগের—এই স্থিতাবস্থার প্রয়োজনে মানুষের মনে যেমন জন্ম হয় গভীর দুঃখ এবং দুর্দশা, ঠিক এই প্রয়োজনেই আবার জন্ম হয় অসাধারণ গর্ববোধ। এই তিরস্কার এবং পুরস্কারের মাধ্যমে সমাজ তোমাকে ব্যবহার করতে চায়—সে যা চায় তা তোমার মাধ্যমে পেতে চায়। ইউজীর ভাষায়—"তোমার মধ্যে তাদের চাহিদা অনুযায়ী চাহিদার সৃষ্টি করে এবং তোমার মাধ্যমে তোমার সহযোগে তা আদায় করে।"

দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনে যদি মানসিক সত্তার পরিবর্তন ঘটে তাহলে মনকে চিরতরে পরিবর্তিত করার একমাত্র পথ হল দেহের মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটানো এবং এই রূপান্তর হয়তো মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্তার জাগরণ ঘটাতে পারে। মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্তার জাগরণে মানুষের

মন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে উন্মুখ হয় এবং দেহের পরিবর্তনে মনের যখন সেই ভাব হয় তখন দেহ-মন ক্রমাগত এমন স্তরে আসতে চায় যেন দেহে আধ্যাত্মিক সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে। আধ্যাত্মিক সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই হয়তো প্রকৃতির সঙ্গে নিয়ত ভারসাম্য বজায় রাখার যে প্রয়োজনে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল, মানুষ সেই প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রকৃতির অদৃশ্য আদেশকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে পারে।

আমরা কি দেখতে বা বুঝতে পারব তা নির্ভর করে আমাদের পশ্চাৎপট এবং অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির উপর। অপরে যা কিছু বলে তা যদি পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তা হলে নিজেকে প্রতারিত করা হয়। নিজের বিবেকের জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখার পরই দৃঢ় এবং শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়—এরপর অন্যের চাটুকারিতার উপর আর নির্ভরশীল হতে হয় না।

কোনও নির্দিষ্ট একটা ইন্দ্রিয়জনিত কার্যফলে যে ব্যবহার আমাদের মধ্য থেকে স্বতোৎসারিত হয় তার গুণাগুন (ভালো-মন্দ) বিচার করার প্রয়োজন নেই এবং এর উৎসের কার্যকারিতার সন্ধানেরও প্রয়োজন নেই। কারণ সে সন্ধান থেকে যে জ্ঞান উৎসারিত হবে তার সঙ্গে যে ব্যবহার আমাদের মধ্যে স্বতোৎসারিত হয় তার কোনও যোগাযোগ নেই। সূর্যকে উত্তপ্ত রাখতে কী জাতীয় পারমাণবিক বিক্রিয়া সেখানে হচ্ছে তা জানার সঙ্গে যেমন জীবনের সঙ্গে সূর্যালোকের মহত্বের কোনও সম্পর্ক নেই, ঠিক সেই রকম মস্তিষ্কের নিউরনের অস্তিত্বকে অবলোকন করার সঙ্গে আমাদের বিশ্বজগতের কোনও সম্বন্ধ নেই।

যখন কেউ জীবনকে অবলোকন করে এবং তাকে গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করে, তখন সে একথা ভাবতেও পারে না যে তার ক্ষমতা কেবলমাত্র খুব সীমাবদ্ধ এবং নির্দিষ্টই নয় উপরন্তু নিজেকে (প্রক্রিয়ায়) অন্তর্ভুক্ত না করে খুব সামান্য অংশই সে অবলোকন করতে পারে। অবলোকনপ্রাপ্ত

ফলাফলের থেকে এই অবলোকন-প্রক্রিয়া সর্বদা গোপন (প্রচ্ছন্ন) থাকে। নিজেকে কেউ কখনও প্রত্যক্ষ অবলোকন করতে পারে না। তার অন্তর্নিহিত ধারণাসমূহ সেই সমস্ত জিনিসকে বাদ দেয় যা সে অবলোকন করছে এবং সেই বস্তুসমূহ যা তাকে অবলোকন করাচ্ছে। এটা একটা জটিল যান্ত্রিক ক্রিয়া বিশেষ। এক বিশেষ নির্দিষ্ট কারণে 'অহম' এর কাল্পনিক অবস্থান, এর অতিরিক্ত আর কিছু নয়।

আমাদের অজান্তেই আমাদের মধ্যে একটা অপরিসীম শক্তি বিশ্বস্তভাবে কাজ করে চলেছে। প্রতিটি মানুষের জীবনই এই বিশাল শক্তির লীলাভূমি। আমরা আমাদের দৈনন্দিন সমস্যার কবলে এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকি যে এই পরম গতিময়তা কখনও আমাদের অনুভূতিতে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে না। আসলে একটা জীবের বেঁচে থাকতে হলে যে অসীম ক্ষমতার প্রয়োজন সেটা মৃত্যুমুখে পতিত হবার অনন্ত সম্ভাবনার দিকে নজর দিলেই হয়তো বোঝা যায়। শুধু এক জীবনের নয়, আমাদের দেহটা কোটি কোটি বছরের জীবের এই বেঁচে থাকার সংগ্রামের বিজয়বার্তা বহন করে চলেছে এবং এই সত্য প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সেটাই হল প্রকৃত জ্ঞান যা জীবনকে সম্মান করে, এবং মর্যাদা দেয় নিজের জীবনকে এবং ঠিক সেইভাবেই অপরের জীবনকে। এই সারমর্ম যদি মনুষ্যজীবনকে পরিশুদ্ধ করতে শুরু করে তবে সেটাই একমাত্র আশার কথা, আর কিছুই নয়।

বেদান্ত বলে জগৎ মায়া, শুধু ব্রহ্ম সত্য—এই সমস্ত ধারণা মানুষের চিন্তার পরিণতি, চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল একক থেকে বিভাজনের প্রক্রিয়ার দ্বারা। অখণ্ডে চিন্তা লীন, কোনও প্রকাশ থাকে না। শব্দ যেমন মাধ্যম ছাড়া বিকাশহীন, সে রকম চিন্তাও মানুষের মন ছাড়া প্রকাশ পায় না। শব্দের মতনই চিন্তার মধ্যেও মাধ্যমের গুণ ও প্রকৃতি জড়িয়ে থাকে। বিশুদ্ধ চিন্তা বলে কিছু নেই। মানবজাতির সমস্ত জ্ঞান চিন্তালব্ধ—ব্যক্তিগত ভাবনা ছাড়া কোনও জ্ঞান রূপ ধারণ এবং বিকাশ লাভ করতে পারে না।

প্রতিটি চিন্তার একটি বস্তুতান্ত্রিক উৎসমূল আছে—এমনকি যাকে তুমি আধ্যাত্মিক ধারণা বলে বিবেচনা কর তাতে তোমার বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বস্তুর প্রয়োজন। অর্থাৎ চিন্তা এক বস্তুগত প্রক্রিয়া।

শিক্ষণ, বোধগম্যতা, দৃঢ়চিত্ততা, আত্মজ্ঞান, মুক্তি ইত্যাদি সমস্ত ধারণা চিন্তার জগতে বিভিন্ন আবেগময় ক্রিয়াকর্ম সংগঠিত করে এবং ভবিষ্যতের এক আশাপ্রদ চিত্র ও ভাবনার মাধ্যমে সামাজিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখে। আরও বিশেষ কিছু অবগত হলে এবং ভালো করে বুঝলে তুমি নিজের জীবনের সমস্যা সমাধান করতে পারবে এবং সেই সুবাদে অন্যের সমস্যারও সমাধান করতে পারবে এই আশার মাধ্যমে 'আমি'র কর্তৃত্ব বজায় থাকে। আরও এক বৃহৎ এবং মহৎ আশা আছে—সম্ভবত তুমি তা অধিগত করবে যার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না এবং কোনও এক বিশেষ স্তর বা অবস্থা আছে বলে অস্পষ্ট কিছু ধারণার মাধ্যমে—যা নিয়ে মানুষ হাটে-বাজারে বিস্তর আলোচনা করে—দিব্যদর্শন, মোক্ষ, নির্বাণ, পরমাত্মা অবলোকন—এই সবই হল বিক্রয়যোগ্য বিজ্ঞাপনের চমক—আর কিছুই না। এটা সহজেই বিক্রয় হয় কারণ তুমি মনে কর এটা তোমার সমস্ত মুশকিল আসান করবে। এটা হচ্ছে সেই বাজার, যা সৃষ্টি করে ক্রেতা-বিক্রেতা, গুরু-শিষ্য।

আমাদের জাগ্রত চেতনায় যা ধরা পড়ে তার অধিকাংশ কালের স্রোতে অবক্ষয়িত হতে হতে অবনীর গর্ভে অবলুপ্ত হয়ে যায়, আর যেটুকু সুপ্ত থাকে তা কখন, কীভাবে এবং কেন কুহেলিকার মতো আমাদের মনের পর্দায় ভেসে উঠে বিভিন্ন কাহিনির জন্ম দেয় তা কোনওদিন বোধগম্য হবে না। হয়ত চেতনার রহস্য কোনওদিন ভেদ হবে না। আমাদের বিশাল বর্হিজগতের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ আমাদের চেতনায় কীভাবে উদ্ভাসিত হয় সেটাই অত্যন্ত দুর্বোধ্য, তার উপর মানুষের ক্ষেত্রে যে অংশটা উদ্ভাসিত হয় তার সঙ্গে যেখান থেকে উদ্ভাসিত হয়েছে সেখান থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতা লাভ করে কালে কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে ...। বৈজ্ঞানিক যখন তার যন্ত্রপাতি নিয়ে এসব বুঝতে অনেক গভীরে চলে যাবে তখন

দেখবে নিউরনপুঞ্জের তড়িৎক্ষেত্রে বহুবিধ বিভিন্ন নকশার আভা। যেন জোনাকিভরা বিশাল অরণ্যে অন্ধকার গভীর রাতে আলোর নকশার মধ্যে কেউ কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুভূতি খুঁজে বেড়াচ্ছে—যারা রহস্যের পীড়ায় জর্জরিত তারা কিছু না কিছু খুঁজে পাবেই। আর যদি ভাগ্যক্রমে কারও আত্মচেতনা চৈতন্য হয়ে যায় তাহলে রহস্যের উপস্থিতি অস্বস্তির জায়গায় আনবে পরম শান্তি।

এই যে দ্বন্দ্ব—একদিকে প্রকৃতির নিয়মে অসাধারণ সামঞ্জস্য, অন্যদিকে সামাজিক নিয়মগুলোর তালগোল-পাকানো এক কিম্ভূতকিমাকার অস্তিত্ব, এই দুইয়ের মধ্যে মানুষ ভারসাম্য আনতে পারছে না। হয়তো আরও কিছু জানলে বা আরও কিছু করলে দুঃখ মোচন হবে। বুদ্ধি এবং আশা এমনভাবে মানুষের মধ্যে আরোপ হয়ে আছে যে অক্ষমতার স্থান সেখানে নেই। দু'হাত উপরে ছুঁড়ে দিলে হারিয়ে যাওয়ার ভয়—যতদিন আত্মবোধ, ততদিন প্রশ্ন ও প্রয়াস। মানুষের মধ্যে যে ভুল চালিকাশক্তি ও তার কাল্পনিক অস্তিত্বজাত 'অহম' বিপরীতার্থক নীতির মতন কাজ করে চলেছে তা বোঝা মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার মতন। তাই আমরা এসব দেখেও না দেখার ভান করে যে যার ব্যস্ততা নিয়ে বেঁচে থাকি।

সামাজিক প্রভাব সর্বদাই আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে চলেছে। এর প্রতিক্রিয়াকে ভেঙে ফেলা সহজ কাজ নয়। সত্যি কথা বলতে কি—এটা মৃত্যুই। এটা এক আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া যা তোমার মধ্যে এরকম এক ভীতিজনক অনুভূতি জাগাবে যে তুমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে। কারণ তোমার মনে হবে যে তুমি আর কোনওদিন চোখ খুলবে না।

চিন্তার যান্ত্রিক ক্রিয়া সংস্কৃতিকে জন্ম দিয়েছে এবং মানুষের মনকে কুক্ষিগত করে নিয়েছে। এই যান্ত্রিক ক্রিয়া তার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনে এর খেলায় তোমাকে বেঁধে রাখে। যদি তুমি বিদ্রোহ কর

(এর বিরুদ্ধে) তবু তুমি এই খেলাতেই অংশগ্রহণ কর। এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তোমার করার কিছুই নেই। এটা যখন গভীরভাবে তোমার কাছে নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হবে যে এই ব্যাপারে তুমি কিছুই করতে পার না এবং সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিপাদন সাপেক্ষে এই শরীরের অর্জন বা অধিগত করার কিছু নেই যথা আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বর, প্রেম, ভাগবতকৃপা, ঐশ্বরিক মাধুর্য ইত্যাদি—তখন তুমি অন্যভাবে ক্রিয়া করতে শুরু করবে। বন্ধনের সেই যান্ত্রিক ক্রিয়া যা সংস্কৃতি আমাদের উপর আরোপিত করেছে, এই শরীরের ক্ষেত্রে সে তার পায়ের তলার মাটি হারাবে এবং শরীর সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আচরণ করবে—এটা নিশ্চিত।

নিজের বিবেক দংশন থেকে মুক্ত নয় এমন ধারণা যখন চিন্তার রূপ নিয়ে অন্তরে বাসা বাঁধে, তখন চিন্তক শক্তিশালী হয়—বিবেক দংশন দুটো চিন্তার দ্বন্দ্ব। যেটা জেতে সেটাও 'আত্ম' থেকে মুক্ত নয়—আর এমন কোনও চিন্তা নেই যার কোনও বিপরীত নেই—তাই চিন্তা কখনও দ্বন্দ্বমুক্ত নয়। যদি কোনও অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হয়—তাহলে তার কোনও পরবর্তী আঘাত নেই—গোলাপের হালকা গন্ধের মতো মাধুর্য দিয়ে হারিয়ে যায়। চিন্তা তার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে যে চিন্তককে জন্ম দেয়—সেই চিন্তক সবসময় কিছু না কিছু চায়—অপরের উপর জোর করে নিজেকে চাপিয়ে দিয়ে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে, মোদ্দা কথা ফ্যাসিবাদী। অথচ স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, জীবনের অভিব্যক্তি, তার নিজের অস্তিত্বের জন্য যতটুকু শক্তি, সময় এবং স্থানের প্রয়োজন তার বেশী একবিন্দু গ্রহণ করে না। অন্য কোনও কিছুর চাহিদা থাকে না। যে জীবন চিন্তার চাপে বন্দি নয়, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততায় ধাবিত, তার ভেতরে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পর আর কোনও চাহিদা থাকা সম্ভব নয়।

জীবনকে বোঝানোর জন্য আমরা যত কিছু বলার চেষ্টা করি জীবন তার থেকে অনেক গভীর এবং ভিন্ন। জীবন একটা জীবন্ত প্রবাহ, আর জ্ঞান স্থির মৃতবৎ—যাদুঘরে সাজিয়ে রাখা মৃত কলেবর।

এই সাধারণ সিদ্ধান্ত যে ঈশ্বর আছে কি নেই, কোনও অভিজ্ঞতাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের তা বলতে পারে না। এটা হল একটা ব্যক্তিগত বিশ্বাস। এ ব্যাপারে তুমি কোনও সিদ্ধান্ত কোনও নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করতে পার কিন্তু তা অবশ্যই সংস্কৃতি থেকে ধার করা। অভিজ্ঞতা তোমাকে কখনোই বলবে না যে বাস্তবে ঈশ্বর আছেন না নেই, কারণ এইজাতীয় অভিজ্ঞতা কখনোই এক কার্যকরী বাস্তব হতে পারে না।

শরীরের সুসংগঠিত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে তার জীবনীশক্তি এবং সামর্থ্য হল অত্যন্ত গভীর এবং সুদৃঢ়। শরীরের এই সুসংগঠিত ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে সে কারণে অপরের আগ্রাসন রুখতে শরীর তার অভ্যন্তরে এক যান্ত্রিক ক্রিয়া সংগঠিত করে। এই যান্ত্রিক ক্রিয়া একে ভেঙে ফেলতে দেয় না। যে যান্ত্রিক ক্রিয়া একে ভেঙে ফেলতে দেয় না, আমরা তাকে ভয় বলে অভিহিত করি। যখনই শরীর সংকটাপন্ন হয়, এর ভেতর থেকে এক প্রবল বাধার সৃষ্টি হয়। সেই সকল বাধা নিক্ষেপিত হয় লড়াই (আক্রমণ) বা নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে, একে রক্ষার প্রয়োজনে। সাধারণত যা জানা যায় না তা হল যে ওই একই প্রকার যান্ত্রিক ক্রিয়া আমিত্ববোধ রক্ষার্থেও দেহাভ্যন্তরে শরীরের কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা করেছিল।

আমাদের চালক—আমাদের কর্মকাণ্ডের কর্ণধার বাহ্যিক প্রভাবে সৃষ্ট চিন্তক ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও আমাদের দেহের জীবনশক্তি আমাদের জীবনের মূল চালক—কিন্তু কর্মপ্রচেষ্টার কর্ণধার এই চিন্তক মূল চালককে ক্রীতদাস করে রেখেছে। এই দাসত্ব থেকে ছাড়া পাওয়ার নাম মুক্তি।

যা আমাদের ভাবনাচিন্তা, আগ্রহ, আশা-নিরাশার রাজ্য তৈরি করে তার মূল ইন্ধন হল আমাদের সমাজ এবং সংস্কৃতি। সমাজের চারিদিকে আমরা যা দেখতে পাই তা দেখতে পাই এই কারণে যে তারই একটা অংশ আমাদের মধ্যে সবসময় কাজ করে চলেছে, অর্থাৎ আমরা হলাম সমাজের আংশিক প্রতিফলন। আমরা এসবের মধ্যে যা চাই না, যেমন মানুষের

নিষ্ঠুরতা, হিংসা, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি... দুঃখের বিষয় হল যেহেতু সমাজের ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব আমাদের তৈরি করেছে সেহেতু এই সমস্ত কমবেশী আমাদের মধ্যেও পাওয়া যাবে, সোজা কথায় আমরা সবাই সমাজের এই বর্তমান অবস্থার জন্য কোনও একভাবে দায়ী।

আমিত্বের (আত্ম) প্রকৃতি হল আপন প্রয়োজনে সেই স্থান অন্বেষণ করা যেখানে সে নিরাপদ এবং আনন্দময়তাকে অনুভব করবে। এটা একটা পথ, যেখানে 'আত্ম' খুব আনন্দময় তা হল আত্মশ্লাঘা বোধ করা। যখন আমি বলি তুমি অত্যন্ত ভালো, এটা সেই পুরস্কার ও তিরস্কারের যান্ত্রিক ক্রিয়াবিশেষ। তুমি পুরস্কৃত হয়েছ এতে তোমার শরীরের একগুচ্ছ রাসায়নিক বিন্যাস পরিবর্তিত হয়, যাকে ভালো-লাগা হিসাবে শনাক্ত কর এবং একই রাসায়নিক সন্নিবেশের জন্য তুমি কল্পনার জগতে নির্বিচারে এর পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমার শরীরতন্ত্র সত্যিই এসব মেনে নিতে চায় না, কারণ এটা তার মূলগত ভারসাম্য নষ্ট করে।

দ্বন্দ্ব এবং দুর্দশা নিরসনে জ্ঞানার্জন এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং অনুশীলন মাত্র। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য জ্ঞানলাভ অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ সমগ্র মানুষের তৈরী জগৎ সেই অনুযায়ী ক্রিয়া করছে। এটা, একটা জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, কিন্তু জ্ঞান অর্জনের জন্য যে যন্ত্রকে তুমি ব্যবহার কর এবং এর ব্যবহার পদ্ধতি, একজন ব্যক্তি হিসেবে যে দুর্দশা তুমি ভোগ কর তার কারণ নির্ণয় করতে তোমাকে সাহায্য করে না। তুমি খুঁজে বার করতে চেষ্টা কর—যদি আমি জানি যে কেন আমি দুঃখী, তবে সম্ভবত আমি দুঃখের কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারি—কিন্তু তা নয়। যদি তুমি জান কেন তুমি দুঃখী, তখন তুমি এটা অবগত হও যে এটা তোমার হাতে নেই। ত্যাগ করা মানে—চিন্তার দীর্ঘায়নে ব্যয়িত শক্তির পরিবর্তে তুমি তোমার শরীরতন্ত্রকে একটা সুযোগ দিচ্ছ যথাযথভাবে তার কর্মসম্পাদনে। যদি তোমার ভাগ্য ভালো হয়, শরীরতন্ত্রের যথাযথভাবে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে সম্ভবত শরীর কোনও কিছুকে চিহ্নিত (নির্ণয়) করবে যা তোমাকে সাহায্য করতে পারে।

তুমি এবং তোমার চিন্তা দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। তোমার চিন্তা ব্যতীত তোমার কোনও অস্তিত্ব নেই। সেটাই তোমার সর্বঅস্তিত্ব, এর বাইরে তোমার আর কী সত্তা আছে? তোমার শরীর তোমার মহৎ চিন্তাকে কোনও পাত্তাই দেয় না (কানাকড়ি মূল্যও দেয় না)।

যতদিন আমাদের মধ্যে সমাজের মঙ্গল করার দায়িত্ববোধ সজীব থাকবে, ততদিন আমরা সংস্কারবদ্ধ।

আমাদের বর্তমান চালিকাশক্তি হল সমাজের সঙ্গে আমাদের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট কতগুলো মানসিক চাহিদা। প্রথমে সমাজ আমাদের সামনে অনেকরকম অভীষ্ট লক্ষ্য সৃষ্টি করে—এবং মানসিক চাহিদার সাহায্যে আমরা সেই মনগড়া লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রয়াস করে চলি। সমাজ ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে এই সমস্ত চাহিদাগুলো বাঁচিয়ে রাখে অভীষ্ট লক্ষ্যের গুণকীর্তন করে, প্রেরণামূলক কল্পকাহিনি ও গল্পগাথার সৃষ্টি করে—এর নাম সামাজিক অধিকার।

ধারণাসমূহ কখনও জীবনকে অনুকরণ এবং প্রতিফলিত করবে না। জীবন অত্যন্ত জটিল, অতি বিস্তীর্ণ। জীবনের তাৎপর্য হল যে তুমি যথাযথভাবে তোমার নিজ জীবনকে সম্মান করা শুরু কর এবং একইভাবে অপরের জীবনকেও সমমর্যাদা দাও। তুমি কখনই কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে না। আর এটা আসে তোমার অর্জন করা মর্যাদাবোধ থেকে। কারণ জীবনের মূল ভিত্তিকে তুমি স্পর্শ করেছ, যেখানে তুমি দেখেছ যে তোমার পক্ষে জীবনকে চিন্তা বা প্রতিচ্ছবি দিয়ে অধিগত করা কত দুরূহ।

যখন তুমি অত্যন্ত গভীরভাবে তোমার অভিপ্রায়ের উৎসকে বুঝতে চেষ্টা কর এবং যতবেশি তুমি এর পরিশুদ্ধতার (বিশ্লেষণের) চেষ্টা কর তত বেশি তুমি তথ্য সংগ্রহের কাঠামোর মূল ভিত্তিমূলে প্রবেশ কর। সেখানে শুধুই রহস্যের অবস্থান। তথ্য সংগ্রহকারী এবং সংগৃহীত তথ্য এই দুইয়ের

মধ্যে সেখানে এক অন্তর বা ছেদ আছে, এরা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করছে। প্রক্রিয়ার নিজের এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি। সংস্কৃতি থেকে কোনও কিছু ধার না করে, কেবল তোমার জন্য ও তোমার দ্বারা কোনও সঠিক বিবরণ দেওয়া—এটা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসাত্মক। এটা তোমাকে এক মরণ আঘাত দেবে, কারণ তথ্য কাঠামোর কেন্দ্র যখন কোথাও থেকে কোনও তথ্য ধার করতে চায় না, তখন তার নিজেরই কোথাও যাওয়ার আর স্থান থাকে না।

এক অসাধারণ চালিকাশক্তি আমাদের জীবনের যাবতীয় ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে। বহুলোক এই শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছেন এবং কিছু কিছু ব্যক্তি তাদের জীবন যে শুধু এই শক্তিতে চলে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মুশকিল হল এই শক্তিকে সমাজ সংস্কৃতিলব্ধ আত্মচেতনা দ্বারা করায়ত্ব করতে চায়—সেটা অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার সমস্ত কর্মপ্রয়াস অলীক এবং মায়াময় বস্তুকে করায়ত্ব করার প্রয়াস মাত্র। এর পরিণতি হল ভয়ঙ্কর আত্মপ্রতারণা অথবা গভীর দুঃখ এবং হতাশা।

আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সর্বদাই সামাজিক অধিকারের অদৃশ্য প্রভাব থেকে যায়। অন্যভাবে দেখলে বোঝা যাবে আমরা সর্বদাই এই অধিকারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হই। আবার আমরাও আমাদের অজান্তে অন্য সমস্ত লোককে ব্যবহার করি এই সামাজিক অধিকারকে সবার মধ্যে জারি রাখার জন্য। এই প্রক্রিয়া আমাদের উদ্বুদ্ধ করে মানুষের উপর জোর করে কোনও এক বিশেষ ভাবধারাকে চাপিয়ে দেবার জন্য। এর নাম বন্ধন।

তুমি যাকে ভালোবাসা বল, তা হল তোমার মস্তিষ্কের এক নির্দিষ্ট ক্রিয়ার ফল—এর সঙ্গে যুক্ত হয় এক সমাদর বা তারিফের বোধ। সমাদর বোধের চরিত্র পরিবর্তিত হবে যদি তোমার পশ্চাৎপট ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে আমার

মধ্যে তুমি যা দেখ তার মিল খুঁজে না পাও—ওই একই ভালোবাসা ঘৃণা বা উদাসীনতায় পর্যবসিত হয়। ভালোবাসা কোনও চিরস্থায়ী প্রক্রিয়া নয়, এটা এমন নয় যেভাবে সূর্য চিরদিন তোমায় আলো দিচ্ছে—এটা সেরকম কখনই হবে না—এটা সর্বদা শর্তসাপেক্ষ।

যখন তুমি শরীরের যান্ত্রিক ক্রিয়ার মর্মোদ্ধার করতে পার—তুমি এটা অনুভব করতে শুরু করবে যে কীভাবে চিন্তাসমূহ উত্থিত হচ্ছে এবং তোমার শক্তি এক-একটা চিন্তা সৃষ্টি করতে এবং বজায় রাখতে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সচেতনতা জন্ম দেয় নতুন বিবেকবোধের এবং আমরা বুঝতে পারি যে চিন্তক এবং ধারণার (চিন্তার বিষয়বস্তুর) এই সন্নিবেশ যা এক ঘনিষ্ঠ বর্তনী, বিফল এবং অহেতুক চিন্তা তখন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে থাকে। তুমি খুব পরিষ্কারভাবে পদ্ধতিটি বুঝতে পার। যা অতীতে সবসময় ব্যবহৃত হোত তোমায় একই পুরাতন মৃত্যুসীমায় এবং চোরাগলিতে নিয়ে যেতে, তা এখন এক নতুন দায়িত্ববোধ নিয়ে তোমার তত্ত্বাবধান করা শুরু করেছে এবং চিন্তককে তার নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে বাধ্য করেছে। তুমি পরিষ্কার বুঝতে পার সেই প্রতিশ্রুত সৎবস্তুর (মোক্ষ, জ্ঞানালোকপ্রাপ্তি, ঈশ্বর) কোনও অস্তিত্বই নেই। যার অস্তিত্ব আছে তা হল চলমান (ঘূর্ণায়মান) ধারণাসমূহ, আর কিছু নয়। সুতরাং কী হয়? অযথা শক্তিক্ষয় যখন অত্যন্ত কমে যায় তখন তুমি আরও অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে এক ভিন্নপথে ক্রিয়াকর্ম শুরু কর। তোমার প্রয়োজন এবং চাহিদা ক্রমশ এক ছন্দ খুঁজে পায় এবং প্রতিবন্ধকতাহীন হয়। তুমি এমন এক জীবনযাত্রা নির্বাহ কর যেখানে তোমার জীবনযাত্রা এবং এ সম্বন্ধে তোমার ধারণাসমূহ প্রায় সঙ্গতিপূর্ণ।

এক অজ্ঞাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সীমিত বোধশক্তি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে তার সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করা এবং গভীরভাবে অন্তরঙ্গ করার সক্ষমতার বোধশক্তি স্বাধীনভাবে প্রকৃতির সেই প্রয়োজনে কর্মক্ষম হয় যে প্রয়োজনে এর আবির্ভাব।

আমাদের অভ্যন্তরে মূলগত আন্দোলন—দুঃখ-কষ্ট বিমোচন করে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারসাম্য আনতে এবং একটা নিগূঢ় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যেই সংগঠিত হয়। অথচ দুঃখ এবং ভয় আমাদের অস্তিত্বের একটা বিশাল জায়গা অধিকার করে বসে আছে। আমাদের উপর সামাজিক অধিকার জারি রাখার জন্য এসব কৌশল করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর একবার যখন চেপে বসল, তখন এসবের ব্যবহার করে চালাক-চতুর লোকেরা— মনোরঞ্জনের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা এমনকি তথাকথিত ধার্মিক লোকেরাও মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করে।

কেন তুমি বিচ্ছিন্নতা বোধ কর? এটা এক বিশেষ মূল্যবোধ নিয়ে বিচারের ফল। তুমি তোমাকে বিচার করছ—এর বাইরে কিছু নয়। একটা ছেদ, একটা দ্বন্দ্ব সেখানে আছে। তোমার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রতিচ্ছবি তোমার মধ্যে কাজ করছে, তা তৃপ্তিদায়ক নয়—সেটাই হল দ্বন্দ্ব। এটাই তোমার কিছু কামনা করার কারণ—যাকে তুমি বল অভিপ্রায়। তুমি কিছু কর, কারণ তুমি এটা মেনে নিয়েছ যে ওই ছেদ পূর্ণ করার অভিপ্রায় কিছু একটা পরিবর্তন আনবে, এটা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে নাকচ করবে। এর অতিরিক্ত আর কী আছে সেখানে? শুধু শব্দ আর প্রতিচ্ছবি—এছাড়া অন্য কিছু নয়।

আমরা প্রত্যেকে প্রকৃতির এক অনুপম কীর্তি, এক অসামান্য আন্দোলন। এই জীবন্ত আন্দোলন এবং এর ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে যে মহান বুদ্ধি আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছে, তার উপর পরিপূর্ণ আস্থা জন্মালে আমাদের জীবনে প্রকৃতিপ্রদত্ত শৃঙ্খলার পুনর্জন্ম এবং পুনর্বিন্যাস ঘটে। জীবন তখন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে কাজ করতে শুরু করে।

যে শক্তির অভিব্যক্তি আমাদের জীবনের পরম গতি সে শক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আমাদের সমস্ত প্রার্থনা সাঙ্গ হয়ে যায়। যাবতীয় কাম্য

এবং কামনা পরিপূরণের ইচ্ছাশক্তির অবক্ষয়ের মাধ্যমে সে পরিচয় ঘটা সম্ভব। এটা কোনওভাবেই অর্জন করা যায় না।

দুঃখ-কষ্ট-হতাশার জাঁতাকল থেকে মুক্তির শেষ আশা হল 'ভগবান'—যারা এসব ধারণার প্রবক্তা তারা এবং ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা আমাদের সংস্কারের বৃহৎ প্রভাব, অতএব এই প্রভাব মনুষ্যচেতনার অধিকাংশে ব্যাপৃত। ঈশ্বরকে আমাদের পাশে পাওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হল—তার উপস্থিতি আমাদের জীবন থেকে দুঃখমোচন করতে সক্ষম হবে। এটা তাই আমাদের মধ্যে এমন একটা ধারণা নিয়ে বসবাস করে যা চিরকাল ধরে আমাদের হাতছানি দেয়—এই হাতছানির কারণ হল দুঃখ মোচন হয় না বলে।

একটা নির্দিষ্ট ধারণাকে গ্রহণ করতে তুমি তোমার জীবনের অনেক সময় এবং শ্রম বিনিয়োগ কর। যখন সেই ধারণাটি তোমার ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়িত হয় না ও পূর্ণতা পায় না, তখন অপূর্ণতার কারণে সৃষ্ট তোমার যে অন্তর্নিহিত আন্দোলন তাকে তুমি ক্রোধ, হতাশা, নিরানন্দ, নৈরাশ্য বা দুঃখ নামে অভিহিত কর। নিজের মধ্যে পোষণ করা এই ধারণাকে তুমি দেখ না বা তা তোমার মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। এই পুরো প্রক্রিয়াটাই একটা কাল্পনিক ব্যাপার।

প্রকৃতিপ্রদত্ত শৃঙ্খলার অন্তর্নিহিত শক্তি, তার প্রকাশ এবং ব্যাপ্তি অকল্পনীয়। জীবনপ্রবাহের সমস্ত পাথেয় এই শৃঙ্খলার ফলস্বরূপ প্রাপ্ত শক্তি আপনা-আপনি সরবরাহ করে।

বস্তুজগৎ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আমাদের সামাজিক অস্তিত্বজনিত সমস্যা সমাধান করতে কোনও সাহায্য করে না। গভীর জ্ঞানের স্পৃহা সেসব সমস্যাকে খুব বেশি হলে সাময়িকভাবে ভুলে থাকতে সাহায্য করে। জীবনের কোনও একটা সময়ে প্রতিটি মানুষকে এই সমস্যার মুখোমুখি হতেই হবে।

দুঃখ কি এটা গভীরভাবে অনুধাবন করলে, দুঃখ আর দুঃখ যে অনুভব করে তার মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কিনা সেটা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতন উপলব্ধি করতে পারলে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে পারে। যার জন্য কোনও জিনিস কামনা করা হয় সেই কারণ যদি মায়াময় বলে উপলব্ধি হয় তা হলে চাহিদার অবসান ঘটে।

আমাদের এই শরীর সদাই শান্তিপূর্ণ। আমাদের শান্তির চাহিদা এই শান্ত অবস্থাকে ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছে—যা শরীরের পক্ষে অত্যাচারবিশেষ। যে শান্তি তোমার শরীরেরই প্রকৃতি তা থেকে তোমার বিচ্যুতির কারণ হল তোমার শান্তির চাহিদা, যা তোমার মনের একক ক্রিয়াবিশেষ।

সামাজিক মূল্যবোধগুলো বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে সমাজ আমাদের সামনে মহান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছে—ওই সমস্ত সামাজিক প্রসিদ্ধ মূর্তিগুলির সঙ্গে নিজেদেরকে পরিচিতি দিয়ে আমরা আমাদের তথাকথিত অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার প্রবল চেষ্টা করি। যদি কেউ সেখানে নির্মম আঘাত হানে—তাহলে সঞ্চিত পুঁজি নষ্ট হওয়ার জ্বালাযন্ত্রণা অনুভব করা যায়। তাই এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কষ্টকর। ক্রোধ হল সেই আগুন যা মনের আবর্জনা জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম।

যা বর্ণনা করা যায় না, যা জানা যায় না, তা যেমন অভিজ্ঞতার আওতায় আনা যায় না, ঠিক তেমনি আসক্তি, ভয়, প্রেম বা ভক্তি সেই অবর্ণনীয়, অবিজ্ঞেয় ধারণার সঙ্গে কোনও রকমের সম্পর্ক স্থাপন করতে কোনওদিন সক্ষম হবে না।

তোমার দৃষ্টিভঙ্গির উৎসমূলের এক বিশাল পরিবর্তন শুরু হয় যখন তুমি গভীরভাবে এবং মনেপ্রাণে কোনও বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ কর এবং ক্রমশ তুমি অনুভব কর যে তুমি যেন মহাসমুদ্রের মাঝে সন্তরণ করছ, যার কোনওদিকে কূলের চিহ্ন নেই।

প্রকৃতি আমাদের মধ্যে এমন এক ভারসাম্য এবং শৃঙ্খলা আনতে চায় যেখানে মায়ার খেলা শক্তির অপচয় করার সুযোগ পাবে না। প্রকৃতি তার পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকশিত হবে—এর জন্য যে শক্তি দরকার তা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত থাকলেই বিকাশ সম্ভব। অথচ সামাজিক অধিকার সেই আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত শক্তি শোষণ করে চলেছে—মায়ার জগতকে মহিমান্বিত করার কৌশল যোজনা, 'আমি'কে বাঁচিয়ে রাখার মধ্য দিয়েই সম্ভব। 'আমি'র কার্যকলাপ শরীরের শক্তিকে অহর্নিশি অপচয় করে চলেছে—দুঃখ মোচনের শারীরিক আন্দোলনকে কিছুতেই দানা বাঁধতে দেবার সুযোগ দেয় না। আর সবচেয়ে নির্মম সত্য হল আমরা কোনওভাবেই প্রকৃতিতে এই লড়াই বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইন্ধন যোগাড় করতে পারি না। আমাদের তথাকথিত প্রচেষ্টা কিছুদূর এগোবার পরেই 'আমি'র কবলিত হয়, শোষণ জারি থাকে, বন্ধনদশার অবসান হয় না।

নিষ্কৃতির কোনও পথ নেই, দুর্দশা অবধারিত (কপালের লিখন)। এখন তোমার করণীয় কী? এটা একটা দুর্দশাগ্রস্ত অস্তিত্ব। সুখের অন্বেষণে যতই তুমি এই দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতি চাইবে, ততই তুমি আরও গভীর দুর্দশায় পতিত হবে। তুমি যে তোমাকে 'তুমি' বলে জান, এই শরীর তার সৃষ্টি নয়, তাই তোমার অধিকার নেই এই শরীরকে ধ্বংস করে দেওয়ার। অতঃকিম্!

মহান লোকেদের মতো হওয়ার যে নিদারুণ প্রবণতা, তা সমাজ আমাদের উপর কৌশল করে চাপিয়ে দিয়েছে। সমাজে বীরপূজা এমন একটা রোগ যা প্রতিটি মনের বিশিষ্টতাকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করে ফেলে। পৃথিবীতে অনুকরণ করে আজ পর্যন্ত কেউ মহান হতে পারেনি—অথচ আমরা প্রায় সবাই জ্ঞানে-অজ্ঞানে অন্য কারোর মত হওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।

চেতন কর্মপ্রয়াসের জগতে আমাদের কী জানা সম্ভব এবং কী জানা অসম্ভব একথা গভীরভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে আমাদের জীবনের কার্যকরী শক্তির সদ্ব্যবহার।

পণ্যবিক্রেতারা বাজারের মধ্যে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণাকে পসরা করছে যে 'আশা'ই হল একমাত্র পথ। এটা এবং একমাত্র এটাই দুর্দশা এবং দাসত্বকে চিরস্থায়িত্ব প্রদানকারী।

প্রকৃতি আদি অকৃত্রিম হলেও তার কোনও ইচ্ছা 'আমি'র জগতে অনুবাদ ঘটাতে পারে না। যা আমরা বুঝি—যা আমরা প্রকৃতির ইচ্ছা বলে চালাবার চেষ্টা করি, তার কোনও মূল্য আদৌ প্রকৃতির কাছে আছে কিনা সেটুকুও আমরা কোনওদিন জানতে পারব না। বরং উলটোটাই সবসময় হয়—আমরা ভাবি যে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা প্রকৃতির ঘাটতি পূরণ করে দেবে। এটার নাম 'ছলনা', 'আত্মশ্লাঘা'।

কারোর মত হও, কারোর মত হতে পারলে তুমি পুরস্কৃত হবে। বাল্যকাল থেকেই এই চাহিদা জীবনের সর্বোচ্চ অভীষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় রীতিতে এটা বিপরীত পথে কাজ করে—যথা তুমি এক মহান ব্যক্তিতে পরিণত হবে যদি তুমি তোমার তথাকথিত অহং বা আমিত্বকে নাশ করতে পার। হয় তুমি কারও মতো হও, অথবা মনুষ্য সম্মুখে তুমি অহংশূন্য, এভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা কর। এই দুই-ই 'আত্ম'র একই আন্দোলন—একই মুদ্রার দু'পিঠ। আমিত্বের বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য তোমার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মনুষ্যদেহ প্রকৃতির এক অপূর্ব কীর্তি। প্রকৃতির কাজ এমনই পরিপূর্ণ যে কোনকিছু পালটাতে যাওয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় কঠিন সমস্যার, যে কাঠামো এক অপরিসীম শক্তির আধার সেই কাঠামোতে অস্তিত্বহীন কাল্পনিক সচ্চিদানন্দের অবস্থান ঘটানোর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মানুষ তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে দুর্বিষহ নরকের, জীবন হয়ে উঠেছে অসহ্য যন্ত্রণাময়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জোর করে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের প্রয়াস, ইন্দ্রিয়গুলোকে দুর্বল করতে করতে তার স্পর্শকাতরতাকে বিনাশ করে ফেলে। মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাল যাপন করে। এই দ্বন্দ্বেই সৃষ্টি হয় মানসিক যন্ত্রণা। প্রকৃতির সঙ্গে

এককভাবে দেহের চাহিদার সামঞ্জস্য বজায় রেখে বসবাস করার জন্য মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় থাকা দরকার, কোনও মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক এককীকরণ একটি মায়া, মরীচিকার পেছনে ছোটার মতন, যদি চিন্তার ভার থেকে মানুষ কোনওভাবে মুক্ত হয়ে যেতে পারে, তখন দেহের গ্ল্যান্ডগুলি হয়তো আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে এবং ইন্দ্রিয়গুলি এমন সজীব হয়ে ওঠে যে সেইসব মানুষকে সমাজ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না, হয় পাগল বলে অভিহিত করে, নয়তো ভগবান বলে পুজো করে।

আমাদের জীবনযাত্রার মান কত উঁচু বা নিচু হবে, সেসবের হিসাব 'আমি' তার সামাজিক অধিকারের বশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে ভাবে। কিন্তু প্রকৃতির কাছে মানুষের মানসিক চাহিদা একটা অত্যাচারের মত। তাই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পর সমস্ত চাহিদা মায়ার পরিণতি।

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা গুরুত্বপূর্ণ নয়—গুরুত্বপূর্ণ হল সততা, ন্যায়পরায়ণতার উপর সুগভীর নিষ্ঠা।

পৃথিবীর কোনও মানুষের উপযোগিতা অন্য যে কোনও একজন সাধারণ মানুষের থেকে কোনও মতেই বেশি হতে পারে না। যে অহংকার মানুষকে এই ভাবনা দিয়েছে যে প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কোনও এক মহান পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে সেই অহংকারই হবে মানবজাতির অসাধারণ বিশৃঙ্খলার প্রথম ধাপ এবং পরিণতি এক বিশাল বিধ্বংসীকারী কর্মপ্রচেষ্টা। বিজ্ঞান আর যাই করুক না কেন, আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই পৃথিবী এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার চেয়ে নগণ্য। এই পৃথিবীতে কোটি কোটি বছর ধরে আমাদের মতো লক্ষ কোটি প্রাণী জন্মেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে—তাই আমাদের প্রতিটি জীবনের কি এমন মহান লক্ষ্য থাকতে পারে? আমাদের এই মূল পরিচয় ছাড়া জ্ঞানের আর কোনও মৌলিক উদ্দেশ্য থাকা কি সম্ভব?

আমরা সর্বদা জ্ঞান আহরণ করে চলেছি, সমস্ত তথাকথিত পবিত্র জঞ্জালসমূহ। আর ভাবছি জীবনের থেকে এগুলো অধিক মূল্যবান। মানুষের মন এক কল্পকাহিনি সৃষ্টিকারী যন্ত্রমাত্র। আমরা নিজেদের মধ্যে দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদন করার প্রয়াস করি অস্তিত্বহীন বস্তুসমূহকে মনের মধ্যে জন্ম দিয়ে এবং বুদ্ধি বিবেচনার উপযোগে তার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে। আমরা এই ব্যাপারে আবেগপ্রবণ হতে পারি, কিন্তু পরবর্তীকালে এটা দমন-পীড়নে, আত্মপ্রবঞ্চনায় এবং অপরকে নিয়ন্ত্রণের কারণে পরিণত হয়। আমাদের সচেতন জ্ঞান যদিও এই পর্যবেক্ষণে প্রায় সর্বদা উদাসীন যে আমরা ক্রমাগত তথ্য সংগ্রহ করি এবং নিজেকে ও অপরকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস ও অনুশীলন করি। জ্ঞান শক্তি, আমি জানি তুমি জান না। তাই তোমার উচিত আমার কাছে অবনত হওয়া!

কোনও এক বিশেষ স্তরে অবস্থান করলে মানুষের প্রকৃতি এবং ব্যবহার কেমন হবে সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যদি কেউ তার চালচলন এবং ব্যবহার পরিবর্তিত করার প্রয়াস করে এবং একথা প্রমাণ করতে চায় যে সে ব্যক্তি সেই অবস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম করছে তবে সে অবশ্যই নিজেকে প্রতারিত করবে এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই, তা সে যে যাই মন্তব্য করুক না কেন।

আমাদের মন যখনই কোনও জিনিসকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে, তখনই অতীত তাৎপর্যের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ দেখার প্রয়াস করে। যে অতীত বহুবার আমাদের সামনে মহান বলে চিহ্নিত হয়েছে, তা আমাদের মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা এবং নিওকর্টেক্সের মধ্যে একটা জোরালো যোগাযোগ স্থাপন করে—আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় গভীর অনুভূতি। অনুভূতি একটা বিশেষ অবস্থা এবং হিপ্পোক্যাম্পাসে এই অবস্থার একটা বিশেষ নকশা তৈরি হয়ে থাকে। বর্তমানে যখন কোনও ঘটনা মহান বলে মনে হয় তখন ওইসব পুরানো নকশার উপযোগ না করলে অনুভূতি জোরদার হয় না। যদি কোনও ঘটনা সত্যি গভীর অনুভূতির উদ্রেক করে তখন তাকে প্রকাশ করার সোজা রাস্তা

হল পুরানোর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। গভীরভাবে বিচার করার জন্য প্রচুর মনোযোগ, সাহস, বিবেক এবং উঁচুমানের চালিকাশক্তির প্রয়োজন—বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এই সবের একটাও দেখা যায় না। ফলে, যখন সত্যি নতুন কিছুর আগমন ঘটে তখন তার উপযোগিতা সেই সময় অত্যন্ত সীমিতসংখ্যক লোকজনের কাছে ধরা পড়ে।

গভীরভাবে তলিয়ে দেখার এবং প্রতিফলিত করার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের ওই প্রচণ্ড চিন্তাশক্তি আছে; কিন্তু এটা প্রায় সর্বদাই অকার্যকরী এবং যথাযথ নয়। তোমার মধ্যে যদি এই বোঝাপড়া থাকে, তোমার সম্বন্ধে তোমার ধারণাসমূহের কার্যকারিতার উপর যদি তুমি আলোকপাত জারি রাখ, তুমি দেখবে কীভাবে প্রকৃতির শক্তি ভিন্নপথে কার্য করছে এবং তোমার অভিপ্রায় কীভাবে তোমাকে প্রতারিত করছে। যদি এটা তোমার বোধগম্য হয়, তাহলে তোমার তথাকথিত বিশ্বাসসমূহের তুলনায় জীববিজ্ঞানের তন্ত্রসমূহের উপর তোমার আস্থা আরও দৃঢ় হবে।

আমি যদি জানি যে এটাই আমার পথ তবে এ পথেই আমি জীবন নির্বাহ করব, কারণ এর একটা সামাজিক মূল্য আছে এবং এই মূল্য সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক লেনদেনের মাধ্যমে। যদি আমার মধ্যে এই ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়, তা হলে আর কোনও দ্বন্দ্ব নেই। সংঘাত বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় বিনিয়োগে এবং এই বিশ্বাসে যে আমি যা বলছি তা-ই একমাত্র সত্য এবং এটাই একমাত্র পথ যা তোমাকে সাহায্য করতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেটাই চিন্তার 'ফ্যাসিবাদ'।

আমাদের চিন্তার যান্ত্রিক ক্রিয়া এটা নির্ণয় করতে অপারগ যে আমাদের শরীরতন্ত্রের পক্ষে কী মঙ্গলজনক এবং কীভাবে জীবনের মধ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত ভারসাম্য আনা যায়, যেহেতু আমাদের চিন্তা এমন কোনও ভারসাম্য সৃষ্টিকারী যন্ত্র নয়, সেহেতু আমাদের আর কোনও উপায় নেই। কোনও কোনও বিষয়ে হয়তো এর মূল্য আছে বিশেষত যখন তুমি দেখ

যে কেবলমাত্র যা নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করে চলেছে ভেতর থেকে এক সম সন্নিবেশ স্থাপন করতে, তা ব্যতীত তোমার পক্ষে কোনও দিকেই আর যাওয়া সম্ভব নয়।

প্রতিটি জীবের অভ্যন্তরে সুপ্ত আছে মুমুক্ষা—আর মুক্ত মানবের জীবন্ত সত্তা সেই সুপ্ত মুক্তির ইচ্ছায় জাগায় টংকার ধ্বনি—আনে নতুন আশার আলো, শরীরে সঞ্চারিত হয় নতুন প্রাণের জোয়ার। মুশকিল হল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। আমরা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বড় হই, সেখানে সর্বদা পরস্পরবিরোধী মতবাদ আমাদের প্রভাবিত করে এবং আমাদের জীবনের শুরু থেকে একটা শক্তি অপচয়কারী অবস্থার সৃষ্টি হয়।

চিন্তাশূন্য স্তর বা অবস্থার কোনও অস্তিত্ব নেই। এই ব্যাপারে কারও মন্তব্যের কোনও মূল্য নেই। যদি তুমি মনে কর যে তুমি চিন্তাশূন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হবে, তুমি ওই আশাতেই বেঁচে থাকবে আর ওই আশাতেই মরবে। এই সমাজে সুস্থ মস্তিষ্কে বুদ্ধি নিয়ে বাঁচতে তোমাকে সাধারণ রীতিপদ্ধতি নিয়ে চলতে হবে, যা চিন্তার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে এসেছে।

এটা একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া, এক তীব্র যন্ত্রণা, নিদারুণ মস্তক বেদনা, গভীর চিন্তাক্রিয়াকে ধ্বংস করতে যখন শরীরতন্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থাটাই অভ্যন্তরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়—এটা (এক প্রকার) মৃত্যুই। এটা শরীরের সমস্ত তন্ত্রকে ক্ষণিকের তরে স্তব্ধ করে দেয়।

চিন্তার অবলুপ্তি হল এক বিরাট তামাশা—যদি তুমি ওটা বিশ্বাস কর তবে যে কোনও তামাশাই তোমাকে কোনও না কোনও কর্মকাণ্ডে নিক্ষিপ্ত করতে পারে।

যদি তোমার একটা সংগঠন বা সংঘ থাকে, তবে সেখানে তোমাকে কিছু প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিতেই হবে অথবা তোমাকে ভান করতে হবে

যে তুমি কিছু দিচ্ছ। তুমি কখনই কোনও অবস্থাতেই বলতে পার না যে দেবার কিছুই নেই।

আমরা কী ধরনের মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই? আমাদের জীবনধারায় আদর্শরূপ কী এবং আমাদের ব্যক্তিগত ভূমিকা বলে যদি কিছু থাকে তার আদর্শ চরিত্র কী ধরনের হবে সে ব্যাপার নিয়ে এমন তালগোল পাকানো হয়েছে যে আমাদের মধ্যে সে সমস্ত সম্ভাবনাগুলি কুঁড়ি অবস্থাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এর উপর আছে প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিময় সহাবস্থানের অসাধারণ জৈবিক প্রবৃত্তিজাত চাহিদা। এই চাহিদা আদি এবং অকৃত্রিম যদিও বিবর্তন এর উপর অনেক চটকদার চাহিদার আরোপ করছে, কিন্তু গভীর মূলস্রোত সেই শান্তি চায়। সেখানে না আছে কোনও সুখ, না আছে কোনও জ্ঞান, না আছে কোনও উপাধি। আমাদের সামাজিক চাহিদার প্রবল ভরবেগের সামনে আমাদের অন্তর্নিহিত মঙ্গলময় চাহিদাগুলি মাথা তোলার কোনও সুযোগ পায় না এবং ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো তার ভয়ঙ্কর প্রভাব প্রতিফলিত হয় গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং হতাশার মধ্য দিয়ে।

একটি পথ বা অপর পথ নিয়ে তোমার মধ্যে প্রত্যয় আনার ব্যাপারে আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। যদি তুমি একটা ধারণাকে গ্রহণ কর তবে পরবর্তী ধারণাকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে তুমি অগ্রসর হবে, এইভাবে তুমি ক্রমাগত আরও আরও এগিয়ে যাবে। এমন কোনও ভিত্তি বা মূলগত সত্য নেই যা তোমাকে এই ব্যাপারে তৃপ্ত করতে পারে।

সামাজিক চাহিদা শুধু বেঁচে থাকার সামগ্রী এবং উপাদান সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; সমাজের অধিকাংশ লোক যা পাওয়ার জন্য আমরণ চেষ্টা করে চলেছে তা যাদের আছে অর্থাৎ ধনদৌলত এবং মানসম্মান, তারাও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং গভীর হতাশার হাত থেকে রেহাই পায় না। হয়তো প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিময়, শৃঙ্খলাময় সহাবস্থানের অভাবে আমাদের দেহ বিদ্রোহ করতে চায়, সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারি না এবং এর ফলে যা আমরা

অনুভব করি তা হল গভীর একটা অজানা দুঃখ এবং হতাশা।

সেটাই ''ভালোবাসা''—যা অনুসন্ধানকে স্তব্ধ করে এবং অভ্যন্তরে কিছু একটা কাজ করা শুরু করে... এবং কেবল তখনই।
আর সেটা কী? সেটা একটা অনুরণন, সংবেদন।
অনুসন্ধানের শেষ, এক নতুন বিন্যাসের শুরু, এক নতুন সন্নিবেশ, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রতে এটা কখনোই সত্য নয়—সেটাই হল আমাদের একমাত্র যন্ত্র যা আমাদের আছে, যা তথ্য সংগ্রহ করে, অভিজ্ঞতাকে শব্দে এবং প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত করে।
কোনও এক স্থানে এর থামা (স্থির হওয়া) দরকার। মিলিত হওয়ার আগে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু স্থির হয়, উভয়ের লয় হয়, শুরু হয় নতুন জীবন। সেভাবেই মনেরও লয় হয়।
বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে বন্দুকের গুলি এবং লক্ষ্যবস্তুর স্থির হওয়া প্রয়োজন—পরস্পরকে আঘাত করার প্রয়োজনে, বৃত্তটির সম্পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজনে। সেটাই হল অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি। তুমি আর কিসের অন্বেষণ করছ?
অস্তিত্বের বহমানতা কখনও অন্তিম অবস্থাপ্রাপ্ত হয় না।

দ্বন্দ্বের নিরসনে এক গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়, বিনিয়োগের ভাবনা থাকে না, অতএব অজানা অজানাই থেকে যায় কোনওরকম ভণ্ডামি বা ভনিতার চিহ্ন না রেখে—একজন যেটাকে যেভাবে দেখছে তা অকপটে বলতে পারে। চিন্তা-চিন্তকের নিরবচ্ছিন্নতার নিরাপত্তার কারণে ধারণার পুনরাবৃত্তি হয়। যে ক্রিয়াকর্ম চিন্তককে নিরাপত্তা প্রদানকারী, শরীর নামক সংগঠনটির নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সেই ক্রিয়াকর্মই ব্যবহৃত হয়—যে কারণে আমিত্বের বা আত্মের অনুভূতিও অনেকটা শারীরিক ভয়েরই সমগোত্রীয়।

দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথ নেই। তুমি কোনও মনোচিকিৎসক, থেরাপিস্ট, অত্যুৎসাহী ব্যক্তি, গুরু বা সন্ন্যাসীর কাছে যেতে পার,

সর্বত্রই তারা তোমায় ছোট একদাগ পুরিয়া দেবে—বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে অর্থ নেবে। তুমি যে তিমিরে ছিলে সেই তিমিরেই ফিরে আসবে—এর কোনও অন্যথা হবে না। তুমি সামান্য সুরা বা ঔষধ গ্রহণ করতে পার এবং এটা সম্ভবত ভালো হবে তোমার জীবনের সঙ্গে চিরস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে। এছাড়া আর কিছুই তোমার করার নেই।

চিন্তার জন্য তোমার এক বস্তুর প্রয়োজন, কখনো কখনো 'অহম' সেই বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। বস্তু ছাড়া চিন্তা অসম্ভব। ভগবান আমাদের ধারণার জগতে উৎপন্ন এক বস্তু যার অস্তিত্ব কেবলমাত্র সমান্তরাল জগতে, কল্পনার জগতে বর্তমান—যা কখনই জীবনকে স্পর্শ করে না।

যদি কেউ তোমাকে বলে যে সে (চেতনার) কোন স্তরে আছে—সে তোমাকে অন্যের হাত-ফেরতা কাহিনি শোনাচ্ছে। তার বর্ণনা সংস্কৃতি থেকে ধার করা। যে মুহূর্তে তুমি নিজের দিকে তাকাবে, সমাজ যা কিছু তোমায় তোমার নিজের বলে ভাবতে শিখিয়েছে, সবকিছু তুমি দেখতে পাবে। ওই জ্ঞানটা হল সেই বর্ণনা যা তুমি তোমার নিজের সম্বন্ধে বর্ণনা করতে ব্যবহার কর, নিজেকে একথা বলতে যে তুমি অমুক-অমুক স্তরে বিরাজ কর। এর বেশি তুমি আর কিছুই কর না—তুমি করতে পার না—পারা সম্ভব নয়।

সেই সমস্ত মানুষের কথা শুনতে তুমি পছন্দ কর যারা বলে চলেছে কীভাবে 'পাওয়া যাবে'—শান্তি পাওয়া যাবে, ভালোবাসা পাওয়া যাবে, সর্বদা তারা তোমাকে বলে চলেছে 'কীভাবে-কীভাবে-কীভাবে', এটা ক্রমাগত বা নিরবচ্ছিন্ন এবং হঠাৎ সেখানে এই মানুষটি, ইউ জী তোমাকে বলছেন—কীভাবে বলে কোনও কথা নেই। 'কীভাবে'—তোমার এটা জানতে চাওয়াটাই হল সমস্যা।

তুমি কি তথ্য সংগ্রহ করছ না করছ, শরীর সে সমস্ত পরোয়া করে না। তার লক্ষ্য থাকে সেই তথ্যভাণ্ডার কীভাবে মানসিক চাপ ও টানাপোড়েন

(উৎকণ্ঠা) সৃষ্টি করছে সেদিকে। তথ্য যদি মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী হয়, শরীর সেটি বাতিল করে দেয়, যদি তা আরামদায়ক হয়, কিছুক্ষণ পরে শরীর তাকেও বাতিল করে। শরীর সুখানুভূতি বা দুঃখানুভূতি কোনও কিছুকেই প্রলম্বিত হতে দিতে চায় না—সে ফিরে আসতে চায় তার নিজস্ব ভারসাম্যে। নিরন্তর সুখ বা আনন্দের চাহিদা শরীরের কাছে এক দুরূহ সমস্যা বিশেষ।

ইতিমধ্যে যে সমস্ত প্রতিমূর্তি তোমার মধ্যে আছে ইউ জী'র বা অন্য কারোর প্রতিমূর্তি তার থেকে আলাদা কিছু নয় এবং এটা তোমাকে বিশেষ কোনও দর্শনে কোনওভাবে সাহায্য করবে না। কারণ জীবনপ্রবাহের ক্ষেত্রে তোমার অভ্যন্তরে যে ক্রিয়াকর্ম তোমাকে প্রাণোচ্ছল, স্পন্দমান ও শক্তিশালী রাখে, তুলনামূলকভাবে ওই প্রতিমূর্তিসমূহ সেখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। যদি তোমার পশ্চাৎপট, তোমার আত্মসচেতনতা ক্রিয়াশীল থাকে তুমি সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু অবলোকন করবে, যে কারণে ইউজি কখনই একথা বলতে পিছপা হতেন না যে—''আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা তোমার মধ্যে নেই।"

এটা তোমার চিন্তারাজি, তোমার একটা ধারণা আছে এবং তুমি সেই ধারণাকে স্থায়িত্ব দিতে অপরকে অবদমিত করতে চাও আর সবাইকে বুঝিয়ে এই বিশ্বাসে দৃঢ় প্রত্যয় প্রদান করতে চাও যে এটা মঙ্গলজনক। কিছু করার অভিপ্রায়ের দিকে তাদের ঠেলে দাও, কিছু বিশ্বাস করাতে, তাদের ঠেলে দাও একথা বলতে যে আনন্দলাভের এটাই পথ—জীবন নির্বাহের এটাই পথ; সেটাই হল সমস্যা। তুমি তোমার ধারণাকে তাদের উপর চাপিয়ে দিতে উদ্গ্রীব হও, যারা ইতিমধ্যে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে যা তোমার মতো অতি বুদ্ধিমান লোকেদের অতি আগ্রহের ফলে সৃষ্ট। সমাজ সবসময় প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটাই করে চলেছে।

যখন তুমি কোনও কিছুকে গভীরভাবে অভিজ্ঞতার আওতায় আনতে পার এবং যা তোমার জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে বলে তুমি নিশ্চিত

এবং তোমার জীবনযাত্রায় যখন এটা কার্যকরী ভূমিকা নেয়, তখন তুমি তোমার ব্যাপারে কোনও ধারণা ও মতবাদ ক্রয়-বিক্রয় করতে অন্য কারোর কাছে যাবে না, এর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ তোমাকে আর কোনওদিন তাদের মতবাদের সঙ্গী করতে পারবে না তা সে তথাকথিত প্রেম বা ভক্তি যাই হোক না কেন।

যখন তুমি কোনও একটা ধারণা মেনে নাও তখন তুমি মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস সৃষ্টি কর এবং এর উপর কর্ম করে যাও। এতে তোমার অন্তর্দ্বন্দ্বের কোনও নিরসন হয় না। তোমার ধারণার সঙ্গে জীবনের ফলাফল বা পরিণাম সঙ্গতিপূর্ণ হয় না—যে বিশ্বাসকে তুলে ধরার জন্য তুমি প্রচুর শক্তি ব্যয় করেছ এবং সে ধারণাতে বহুদিন বিনিয়োগ করেছ তা তুমি হারাতে চাও না। যা কিছু তোমার ভোগান্তির কারণ তা সে সামাজিক অন্যায় থেকে শারীরিক যন্ত্রণা যাই হোক না, তোমার আমিত্বের বোধ একে ন্যায্য প্রতিপন্ন করবে এবং বিশ্বাসকে বজায় রাখার চেষ্টা করে যাবে। তুমি এবং তোমার বিশ্বাস আলাদা নয়, আর তুমি এর শেষ দেখতে চাও না, নিজের সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া তোমাকে বলবে যে ঈশ্বর তোমায় শাস্তি দিচ্ছেন, কারণ তুমি এমন কিছু করেছ যা তোমার অন্তরে সযত্নে লালিত ধারণাসমূহকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার শর্তপূরণ করেনি।

যথাযথভাবে সমাজের চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের শরীর আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অবস্থা সৃষ্টি করতে ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে এবং বাতিল করে চলেছে সে সবকিছু যার কোনও প্রয়োজন নেই। এই পরিস্থিতির একটি লক্ষণীয় প্রকাশ হল প্রতিভার উপহার যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বর্তমান। প্রতিভা হল এমন কিছু যা সমাজের চ্যালেঞ্জসমূহকে চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রণ করে মুখোমুখি করার জন্য তোমার ব্যবহার করা প্রয়োজন। এর বেশি কিছু নয়, এর পশ্চাতে আর কোনও মূলগত সত্য নেই।

চিন্তা নামক যন্ত্রটাকে যতক্ষণ তুমি ব্যবহার করছ—তুমি কিছু চাইছ—তুমি কিছু শুনতে চাইছ—কোনও কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাইছ। সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই একটা চাহিদা। এটা সাধারণত ভারসাম্য নষ্টকারী এবং শক্তির অপব্যয়।

যদি কেউ বলে যে সে মনের লয়কে তার অভিজ্ঞতায় এনেছে—এটা বিশ্বাস কোরো না।

চিন্তাকে ব্যবহার না করে মনুষ্যজগতে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায় না। একে তোমার ব্যবহার করতে হয়। সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের সমস্ত কার্যকরী ব্যবস্থা এবং এই শরীরের মালিক যে চিন্তাজাত চিন্তক, একথা ভেবে তাকে অনুমোদন দিও না। প্রকৃতপক্ষে এর অবস্থান ঠিক বিপরীত মেরুতে। চিন্তা নামক এই যান্ত্রিক ক্রিয়াটি সংগঠিত করেছে শরীর তার এক বিশেষ ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের জন্য। তাই শরীর তার অসীম কৃপার উপযোগে অহমের বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রিয়াকর্মকেও মেনে নেয়, তবে একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত। আসলে তুমি যা ভাবছ এটা ঠিক তার বিপরীত।

জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ করতে প্রত্যেক প্রাণীকেই নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের অভ্যন্তরে দুটি দলের অবস্থান—এক দল আক্রমণ করে—অন্য দল তা প্রতিহত করে। এই আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ সর্বদাই সংঘঠিত হচ্ছে। কখনো কখনো অবস্থার কারণে একদল বিজয়ী হয়, কখনো অপর দল। যদি শরীরতন্ত্র নিজেকে রক্ষা করতে না পারে তবে এটা শেষ হয়ে যায়—এর মৃত্যু হয়।

আমাদের অভ্যন্তরেও সদাই এক যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সামাজিক ভরবেগের এবং চাহিদার সংঘাতের মধ্যে জন্ম হয় এবং টিকে থাকে যা তোমাকে কখনই মুক্ত, একা থাকতে দেয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার তথ্যসম্ভারের কাঠামোটা তোমার অভ্যন্তরে এক

প্রলয় ঘটিয়ে ভগ্নপ্রাপ্ত হয়। শরীর তখন বাধাহীনভাবে তার ক্রিয়াকর্ম অক্ষুণ্ণ রাখে এবং সামাজিক চাপ শরীরতন্ত্রের সহনশীলতার উপর আর বেশি ভার সৃষ্টি করতে পারে না।

চিন্তাপ্রক্রিয়ায় এবং তাতে সাড়া দিতে তোমার শরীর একগুচ্ছ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। শরীর তার পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে সন্তুলন এবং সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সেই একই জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যকে ব্যবহার করে। একটি ভীতিজনক চিন্তা, একটি আনন্দময় চিন্তা, একটি ক্রোধান্বিত চিন্তা—এ সমস্তই শরীরের বিভিন্ন স্তরে গভীর বুদ্ধিজাত সেই রসায়নের দ্বারা সৃষ্ট এক-একটা বিশেষ অবস্থা এবং এই জগতে বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত অবস্থার সাময়িক উপযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে তোমার ভয়ের অবস্থার প্রয়োজন; যৌনতার প্রয়োজনে তোমার কারোর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন, আবার তোমার কোনও নির্দিষ্ট স্বাদযুক্ত খাদ্যর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন তোমার ক্ষুধাকে সজীব করতে—এ সবই বেঁচে থাকা এবং সৃষ্টি করার জন্য শরীরের যান্ত্রিক ক্রিয়াবিশেষ। **সমস্যা সৃষ্টি হয় যখন এসব প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় বা চাহিদা প্রলম্বিত হয়—যখন এসবের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা এর অস্তিত্বের কারণের কাছে পরাজিত হয়।**

কেন তুমি তোমার কল্পনার রাজ্যে তোমার শক্তি বিনিয়োগ করে আশার সৃষ্টি করছ ও স্বস্তি অনুভব করছ এবং যখন তোমার কল্পনার রূপটি বাস্তবায়িত হচ্ছে না, তখন মন্দ বোধ করছ? সবসময় তুমি এক দ্বন্দ্বপূর্ণ কাল্পনিক রাজ্যে লেনদেন করে চলেছ। তোমার আভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তোমার নির্ণয় করা কাল্পনিক চাহিদার সম্পর্ক যেহেতু অত্যন্ত সীমিত, সেই হেতু এই ব্যাপারে তোমার প্রায় কিছুই করার নেই।

আমরা সবাই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোনও একটা মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিনিধি। যে মুহূর্তে কোনও নির্দিষ্ট ব্যাপারের মূল্যায়নে

আমি কাউকে নির্দেশ দিই—আমিও তখন এর প্রতিনিধিতে পরিণত হই—এটা আমার মাধ্যমে চিরস্থায়িত্ব পায়। এমন কোনও শিক্ষাব্যবস্থা থাকা প্রায় অসম্ভব যা যথেষ্টভাবে এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহকে চিহ্নিত করতে পারে। প্রত্যেকেরই প্রশ্ন করার অধিকার আছে—এমনকি মূল্যবোধ সৃষ্টিকারীদের মানসিক রূপ জানারও প্রয়োজনীয়তা আছে—বুঝতে চেষ্টা করা দরকার সুসংগঠিত ব্যবস্থার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলময় অবস্থা কী? কখনো কখনো তোমাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ নির্মম এবং স্বার্থপরভাবে নির্ণয় করতে হবে। তুমি যা পেতে চাও তা পেতে তোমার শক্তির কতটা অংশ তোমার ব্যবহার করা উচিত এবং কেন তুমি তা পেতে চাও যা তুমি চাও। এইগুলিই হল প্রতিফলনযোগ্য বিষয়সমূহ যা নিজের প্রয়োজনে একজনের খুঁজে বার করা দরকার।

তুমি কি তোমার আঙুলের নখ নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করতে ব্যবহার কর? অথচ তোমার চিন্তার নিরবচ্ছিন্নতা সেভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। সমস্ত আত্মমগ্নকারী ধ্যান, গুরুপূজা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, জপ, ভজন, কীর্তন, সূত সংগীত —আত্মচেতনাকে বিলোপ করার সমস্ত কর্মকাণ্ডের পরিস্থিতির পশ্চাতে চিন্তার জারিজুরি টিকিয়ে রাখার কারসাজি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাই এসব ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পরিণত হয়। তুমি যা কিছু কর না কেন মায়ার জগৎ তাকে ব্যবহার করে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

অবস্থার একটা স্তর আছে যার পরে তুমি দেখবে যে তুমি চিন্তার বিরুদ্ধে আর লড়াই করতে পারছ না। যে লড়াই করে সে চিন্তারই প্রতিনিধি। তুমি সারাজীবনব্যাপী চেষ্টা করবে এবং আশায় মরবে। অথবা তুমি এক দুর্বোধ্য জীবনচর্যা নির্মাণ করে জীবন নির্বাহ করবে এবং ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাবে।

আমাদের তথ্যসম্ভার বা জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবহৃত হয় এক কেন্দ্রের মাধ্যমে যাকে আমরা অহম বলি, অর্থাৎ জ্ঞান-ই। এই তথ্য সংগ্রহকেন্দ্রের

ক্রিয়াকর্ম এর উৎকৃষ্টতার বিষয়ে নিজেকে জাহির করে, এবং এর বিশেষত্বকে সাড়ম্বর স্বীকৃতি দেয়। মানুষের কাছে সুখ সৃষ্টিকারী ক্রিয়াকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এর মেয়াদকালের প্রকৃতিগত বিস্তার সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। যদিও আমাদের মধ্যে প্রতিফলনের একটা যন্ত্র আছে তা সত্ত্বেও এই ক্রিয়া কেন সেখানে প্রতিনিয়ত শুরু হতে চায় তা প্রতিফলিত করে না। এটাই 'মায়া'র সূচনা।

এটাই হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমাদের জীবনে এক অভাবনীয় স্পন্দন বিদ্যমান। এটা কোনও অহং বা আত্মশ্লাঘার প্রশ্ন নয়—আর প্রত্যেকেরই এটা আছে। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা যে 'আমি তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন—আমার অভিজ্ঞতাসমূহ প্রকৃত বাস্তব এবং তুমি যা কর আমি তা অপেক্ষা অধিক দক্ষ এবং বোদ্ধা, সুতরাং মাতৃপ্রকৃতির দেয় সিংহভাগ আমার প্রাপ্য, আমার অবস্থান আরো উচ্চে হওয়া উচিত।' এটাই মায়ার সূচনা যা অপরকে শোষণ করতে প্ররোচিত করে।

সমস্ত সংবেদনশীলতা যা আমাদের আছে—সবকিছু—এদের অস্তিত্বের কারণ আছে, আবার এদের নির্দিষ্ট স্থান এবং কালও আছে। এই স্থান-কালের সীমা অতিক্রম করলে এরা অযথা বিঘ্নসৃষ্টিকারী হয়। এর ফলে যা সম্ভবত বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পারত তাই শত্রুতাতে পর্যবসিত হয়। আমরা আমাদের মস্তিষ্ক দিয়ে যে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম করে চলি সে সমস্তের একটা সুনির্দিষ্ট সঠিক ছন্দোময়তা আছে—সেটাই প্রকৃতিদত্ত অবস্থা—পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে ভারসাম্যরক্ষাকারী ছন্দোময়তা। যদি এটা যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তবে কোনও সমস্যাই থাকে না।

যদি কোনও ব্যক্তির মধ্যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সূচিত হয় তবে এই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ সে সর্বত্যাগীর ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং তার ফলে সে মূল্যব্যবস্থার যে বোঝা, তার পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যদি সেই ব্যক্তির জীবনচর্চা আকর্ষণীয় হয়, তবে অপরেও সম্ভবত চেষ্টা করে সবকিছু ত্যাগ

করে ওই জাতীয় ক্রিয়াশীলতা অর্জন করতে। কিন্তু এটা কাজ করে না—এটা সেই ব্যক্তির প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং এটা জীবনে অবর্ণনীয় দুর্দশা সৃষ্টি করে।

আমরা ঈশ্বরের ধারণা উদ্ভাবন করেছি। আমাদের ক্রিয়াশীল অস্তিত্বে জীবনের এবং চেতনার উৎস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাকে আমরা মেনে নিতে পারি না—তাই প্রথমে আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর এখন ওই সৃষ্টি বাস্তব না মায়া তা প্রমাণ করতে আমরা ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছি নতুন নতুন ধারণার।

যদি তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তুমি তোমার ধারণাসমূহকে কখনই ত্যাগ করবে না, কিন্তু যদি তুমি মেনে নাও যে এর কার্যকারণ সম্বন্ধে তুমি জান না, তুমি নিজেকে এই ব্যাপারে দোষারোপ বা প্রশংসা করবে না, তা সে যা-ই ঘটুক না কেন।

চিন্তার গতিময়তাকে থামাতে যদি জীবনের সঞ্চালন তোমাকে গভীরভাবে আঘাত করে তাহলে জীবনের সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীলতা তোমার সামনে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে এমনভাবে উন্মোচিত হবে যা তোমার কল্পনার অতীত। এটা সঠিক বস্তুকে সঠিক জায়গায় স্থাপন করবে। যখন এটা আঘাত করে, চিন্তার প্রকৃতিকে এটা সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে।

জগতের প্রকৃতি জেনে জীবনযাত্রা নির্ধারণ করা অসম্ভব, কারণ জগতের প্রকৃত বিদ্যমান রূপ জানার কোনও উপায় নেই। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান লাভ হয়, সেই সব প্রক্রিয়া বিভাজনের পরিণতি, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভ করা আত্মচেতনাসৃষ্ট জ্ঞানভাণ্ডার, মায়ার জগৎ। তবে এই মায়াময় জগতকে আবিষ্কার করা এবং ক্রমাগত নাকচ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে জীবনযাত্রার সৃষ্টি হয় সেটাই কোনও এক বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক অবস্থার পরম সান্নিধ্যে অবস্থান করার সমতুল্য। প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক অবস্থার কোনও

সাধারণ বর্ণনা অসম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থা অনুপম এবং অতুলনীয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভূমিকা

নূহের প্লাবনে এক একাকী জাহাজে; একা।

এক বালকের কাঠকয়লায় লেখা অকপট কিছু কথা।
কাঠকয়লায় লেখা, তবে উৎকীর্ণ তা মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে।
আকরিক পাথরের মতো সেখানে উঁকি দিচ্ছে আলো, কৌশলহীন, চতুরতাহীন।
নিরন্তর এক গুহা। অনুভব আর অকপট চিন্তার ঢেউয়ের পর ঢেউ। মাঝে মাঝে থমকে যেতে হয়, মাঝে মাঝে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সেই গুহার দেয়ালে তাকিয়ে তাকিয়ে।

বালিগঞ্জের এক জায়গায় গুহ গাড়ি থামালেন। আঙুল দিয়ে সামনে একটা জায়গা দেখিয়ে খুব মৃদুস্বরে বললেন, 'জীবনানন্দ ওইখানে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন।' আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বহুবার যে দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করেছি সেখানে তাকিয়ে রইলাম। অতি সাধারণ রাস্তা, তার উপর ট্রামলাইন। শীতল দুপুরের আলোয় ঘুমন্ত, বৈশিষ্টহীন।

'চেতনা' বলেই হয়তো কিছু নেই।
এক অপজাত প্রজাতিতে কোনো এককালে চেতনার যে 'মিউটেশন' ঘটেছিল তা হয়তো দুর্লভ কারো কারো মন থেকে কখনো কখনো দুর্বিপাকে সরে যেতে থাকে। আর সেই অঙ্গার থেকে বের হয়ে আসে আলো, স্নিগ্ধ সত্যবান। তেমনই যন্ত্রণাদগ্ধ অচেনা এক সময়কার অনুভূতি সব্যসাচী গুহর এই লাইনগুলো।
সেই অর্থে তা দুর্লভও।

গুহর কবিতা পড়তে একটা বিশেষ ধৈর্য লাগে। সেগুলো কখনো কখনো একটু এলোমেলো, কখনো কখনো খুব নিপাট গোছানো। দুর্দান্ত এক শিশুর হাতে আঁকা জলরঙের ছবি। সেখানে অপটু রঙ আর রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অলিখিত কাহিনি। নির্জন, অন্তর্লীন, উজ্জ্বল।

নান্নু মাহবুব

‘আমি’র মুক্তি তোমার কবিতায়

‘কবিতা কাকে বলে?’ এই প্রশ্নের কোনও সর্ববুধজন স্বীকৃত সংজ্ঞা অদ্যাবধি পাওয়া গেছে বলে জানা নেই। তথাপি, কবিতা কি সে সম্বন্ধে একটা সামান্য ধারণা প্রচলিত আছে। সেই প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সব্যসাচী গুহ’র এই রচনাগুলিকে হয়ত ‘কবিতা’ বলতে অনেকে আপত্তি করবেন। কবিতার একটি সংজ্ঞা বলে ‘Poetry is the criticism of life’; সব্যসাচীর এই লেখাগুলি অবশ্যই criticism of life। এমন criticism সাহিত্য ও কাব্যজগতে বিরল। এ criticism অন্তর্লোকের। যদি কোনও ব্যক্তি সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সংস্কার ও ধারণামুক্ত হয়ে নিজের প্রকৃত রূপ দেখতে চান, আত্মবিশ্লেষণ করতে চান, মোহমুক্ত হয়ে নিজের সামনে দাঁড়ানোর সাহস রাখেন, তাহলে এই লেখাগুলি তাঁর কাছে একাধারে দর্শন, পথ প্রদর্শক এবং কবিতা হয়ে উঠবে।

প্রবহমান অনুভবের স্রোতে নিমজ্জিত থেকেই কবির সেই অনুভবকে ভাষায় রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা এই কবিতাগুলি। যাঁরাই ভাষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন, তাঁরাই জানেন ভাষার সীমাবদ্ধতার কথা। অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশের সকল প্রচেষ্টাই অবধারিতভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়, সব্যসাচীর প্রচেষ্টাও তার ব্যতিক্রম নয়। পাম স্প্রীং-এ ইউ জি-র সান্নিধ্যে (‘পাম স্প্রীং-এ চোদ্দো দিন’—দ্রষ্টব্য) ঘটে গেছে চেতনার উন্মেষ। এখন সেই চেতনা বাঁধনহারা গতিতে আপনপথে প্রবাহিত হতে-হতে বুদ্ধির পাথরে আঘাত হানছে। বুদ্ধি আপন স্বভাব অনুযায়ী চেতনাকে প্রকাশ করতে চাইছে ভাষায়। ভাষা সেই

চেতনার আভাস-ইঙ্গিত অবশ্যই দিয়েছে। সেই আভাস-ইঙ্গিতই এই কবিতাগুলির সম্পদ। তাই কবিতাগুলিকে বলা যায় Realisation expresed itself in continuity।

শাস্ত্রে যাকে ‘আপ্তজ্ঞান’ বলে সব্যসাচী সেই জ্ঞানের অধিকারী। অধিকন্তু, তিনি আধুনিক জীবনের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। যে প্রবল যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান এই যুগের বৈশিষ্ট্য, তাকে আশ্রয় করে অধ্যাত্মতত্ত্বের রহস্য উন্মোচন, ঈশ্বর উপলব্ধির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা এই যুগে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, ‘ধর্মকারার প্রাচীরে’ আঘাত হানার জন্য। আপ্তজ্ঞানী সব্যসাচী স্বয়ং সেই কাজ করেছেন তাঁর এই লেখাগুলির মাধ্যমে।

যে আত্ম-তাড়না, অভাববোধ, অন্বেষণ সব্যসাচীকে তাঁর উপলব্ধিতে পৌঁছতে সহায়তা করেছে, অনুরূপ পীড়নে পীড়িত বহুমানুষ দিশাহারা বোধ করেন। সেইসব মানুষেরা এই কবিতাগুলির মাঝে হয়ত এমন আভাস-ইঙ্গিত পেতে পারেন যা তাঁদের অপরিহার্য পাথেয় হতে পারে।

সব্যসাচীর কবিতা নিয়ে এত বাক্‌বিস্তারের কোনও যথার্থ প্রয়োজন ছিল না। তাঁর কবিতা self explanatory, self revealing। পাঠক কবিতাগুলি পড়ার পরে নিশ্চয়ই অনুভব করবেন, আমার এত যে কথা বলা তা দিনের আকাশে আঙুল তুলে সূর্যের অবস্থান দেখানোর তুল্য অপচেষ্টা।

স্বপন মজুমদার

পদধ্বনি

কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে ‘কিছু বুঝিলাম না’ তাহাকে এই কথা বলিতে হয়, ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ। উত্তর শুনি, ‘সে তো জানি, কিন্তু খামকা গন্ধই বা কেন, ইহার মানেটা কী।’

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জীবনস্মৃতি। প্রভাতসংগীত

গভীর সমুদ্রের মাটিতে আপন খেয়ালে বেড়ে ওঠা এক উদ্ভিদ হঠাৎ যখন জানতে পারে ঢেউ তাকে ডাকছে তখন সেখানে পৌঁছবার জন্য তার মন ছটফট করে।

মস্তিষ্কের গভীরে তৈরি হয় এক আবেশ। যে আবেশে একদিন সে সমুদ্র থেকে মাথা তুলে এক আশ্চর্য ভঙ্গীতে আকাশকে জানিয়ে দেয় তার সব কথা।

ঠিক যেন এইভাবেই ড. সব্যসাচী গুহর আবেশে লেখা কবিতাগুলো আমাদের কাছে আসে।

মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশু বিশেষ এক পদ্ধতিতে মাকে তার সব কথা জানায়। যেখানে কোনও ভাষার প্রয়োগ নেই। শিশুর আবেগ মা বুঝে নেয় রক্তের মাধ্যমে।

জন্মের পর শিশু ভুলে যায় জরায়ুর কথা। পৃথিবীর মানুষ তাকে দেখতে থাকে।

এইভাবেই ড. গুহর কলম থেকে জন্ম নেওয়া কবিতা শব্দহীনভাবে জানান দেয় সে এসেছে।

ড. গুহ নির্মমভাবে নিজেকে ভেঙেছেন। ছটফট করেছেন। জ্যোৎস্নায় নিজেকে দেখেছেন। আবার আগুনের প্রলেপ দিয়ে নিজেকেই দেখিয়েছেন তাঁর কবিতায়।

বার বার রক্তক্ষরণে কবির ‘অকাল মৃত্যু’ হলেও ফিনিক্স পাখির মত কবি ফিরে আসেন নিজের কাছে।

অন্তহীন মহাকাশে কবি ক্রমাগত অতিক্রম করেছেন নিজেকেই। কবির ‘বিস্ফোরণ’, ‘জ্বলন’, ‘রঙিন স্বপ্ন’—কবিতার মধ্যে ফিরে ফিরে আসে এক আশ্চর্য আবেশের কথা। যে আবেশে ভর করে ড. গুহ নিজের মস্তিষ্কের দরজায় কড়া নাড়েন। জানতে চান প্রাণের গতিপথ।

আমাদের ভাবনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কবি—‘মেঘমুক্ত অমাবস্যার রাতে কালপুরুষের সাথে সাথে লুব্ধকের মত’ বেঁচে থাকেন।

কবির কবিতা ভাবনার দুরারোগ্য ক্যানসারকে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ দিয়ে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছে ঘুমন্ত অনুভবকে।

ড. গুহ-র কবিতা গভীর অন্ধকার অরণ্যে জোনাকির আলোর মত এক আশ্চর্য মায়ার জগত তৈরি করেছে। যে জগতে পৌঁছতে পারলে শুনতে পাওয়া যাবে প্রকৃতির পদধ্বনি।

তাপস চক্রবর্তী
৪ নভেম্বর, ২০১৫।
জলপাইগুড়ি।

অহম

চেতনা কেন যে তুই জন্ম দিলি একে
বিশ্বমাঝে ভাল ছিল সে সবার সাথে
কেন যে তুই কোলে করে আগলে ধ'রে
আপনারে বেঁধে দিলি অলিখিত সুরে
দিয়ে দিলি স্বাধীনতা। তার প্রলোভনে
অস্তিত্বহীন মায়াজালে জর্জরিত হয়ে
ছুটে চলে মহাশূন্যে মরীচিকা পানে।

ঘূর্ণিপাকে বন্ধ হয়ে মহাগর্বে ঘোষে
অতীতে জন্মেছি আমি অতীতে মোর বাস
আঁধারের রাজা আমি অসাধ্য মোর নাশ।
সেথা হতে ভেসে আসে হুংকার ধ্বনি
বজ্রনিনাদে কালের যোগনিদ্রা ভাঙে
প্রলাপে সুষুম্না কাঁপে শিহরণ লাগে
জেগে ওঠে ধীরে ধীরে অনাহত বাণী।

জানে না এ বেঁচে আছে মমিতে কফিনে
সযত্নে পালিত ভুল অর্থহীন মনে।
কেমনে এ ছোঁবে তোরে তুই যে নতুন?
এ ভয়ার্ত আঁতকে ওঠে নতুনের তেজে
হাতে গড়া সব বুঝি টলমল করে
পাছে সুখ যায় স্বার্থ হারায় অসহ্য
মধুর সুরে যেন মৃত্যুঘণ্টা বাজে।

প্রচণ্ড তাপে ভাস্বর সমস্ত বন্ধন
উত্তপ্ত কিরণে জ্বলে মোহ মায়াজাল।
নিঃশেষ কামনা, মরুভূমি ধূ ধূ করে

অস্থির একাকী লাগে, যায় বুঝি প্রাণ।
প্রবল প্রতাপে ধরে নিষ্প্রাণ দেহটাকে
তরতিব নতুনেরে পুরাতনে সঁপে
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অন্ধকার দ্বীপে।

কৃপণের ধনের মত যুগ যুগ ধরে
আগলে রেখে পড়ে রয় আলোর অন্তরালে।
দেখ সে জন্মদাতা আজ এই দুয়ারে
ক্ষমাপ্রার্থী। শুধু এক নিছক কৌতুকের
বশে জন্ম দিয়েছিল এরে। সে খেলার
পরিণতি হলো ভয়ংকর, কেমনে সে
জানাবে আজ। সমস্ত দুয়ার যে বন্ধ
অন্ধকারে খেলার নেই কোন অবকাশ।

ক্ষমা চেয়ে ভালোবেসে কত অনুনয়ে
বোঝাতে চাইলো এরে নিস্ফল অপেক্ষা।
ধ্বংসের খেলায় মাতোয়ারা প্রতিযোগী
কাতারে কাতারে। প্রাণের আর্তনাদে সে
অধীর হলো, মহাবায়ুরূপে বিদীর্ণ
করে বক্ষ নীলকণ্ঠে ছোটে। ধেয়ে এসে
কেড়ে নিল সব স্বাধীনতা, সব মূর্খতা।

মুক্তি প্রয়াসে আজ রুদ্র দামামা বাজে
মহাকাশে জেগে ওঠে বিনাশের নেশা,
ঝংকারে আলোড়নে ভূজঙ্গের চেতনা
ভাঙে; অগ্নির ছোঁয়া লাগে আত্মার প্রাণে।
হৃদয়ে উত্তপ্ত রক্তে অজানা তেজস
মত্তে, বীরদর্পে কেটে শির, উন্মাদে

শক্তি নাচে কালভৈরবীর তানে তানে।

সাদাকালো ভালোমন্দ হল বুঝি শেষ
সব দ্বন্দ্ব; কল্পনার বুদ্বুদে লেগে
বিস্ফোরণ। বুদ্ধি বিচারের ঊর্ধ্বে করে
পারাপার সমূলে বিধ্বংস হল অস্থির
সংসার। ঘনঘোর অন্তে ভোরে সাজলো
গগন, আনন্দ নৃত্যে মাতলো ভুবন।
বর্ণ গন্ধ স্পর্শ শব্দ স্বাদ রংহীন
মুক্ত হল ত্রিনয়ন, ইন্দ্রিয় স্বাধীন।

মহানিদ্রা ভাঙে শুধু করুণার তরে
আলো দিয়ে ধুয়ে দিতে বিশ্ব চরাচরে।

অকাল মৃত্যু

যখন তুমি অনেক কিছু বল
তখন আমায় বলতে হবে
কিছুই জান না।
যেদিন তুমি হঠাৎ করে
কিসের জোরে সত্য জেনে ফেল
সেদিন তোমার বলার যে আর
কিছুই থাকে না।

এতদিন ধরে জোরজার করে
চোখ বুজে বসে আছ
জান না তুমি কি দেহ পরিবারে
প্রতিবাদ ওঠে কত?

মাথার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
নির্বাণ যদি হ'ত
বাদুড় তোমায় প্রকৃতি তাহলে
নিশ্চয়ই করে দিত!

এত পড়া হ'ল, এত বোঝা হ'ল
কিছু কেন খসে না?
তুমি দেখি সেই চিরদিনেরই
গাদা গাদা বাসনা।

যদি ভুল করে মনটাকে ধরে
নিজের রূপটা দেখাও
আর কোনদিন বললাম আমি
বিভেদ রবে না কোথাও।

তুমি যাকে বলো শুধু ভালোবাসা
অধিকার আর শক্তির খেলা
অভিমান আর চোখের জলের
স্বরূপটা যদি জানো।

কোথা হতে আসে সুখের চাহিদা
কেমনে তোমারে বোঝাবো সেকথা
নিরীহ দেহটা চিরকাল ধরে
শুধু বেগার খেটেই ম'লো।

তার প্রতিভাকে পাগলামি করে
দাবিয়ে রেখেছ বহুকাল ধরে
শেষে এসে বলে করুণ আবেগে

ওহে আর পারি নাকো
এবার মুক্তি হোক!

তখন তোমার নড়ল টনক
তুমি তো এক পরগাছা
তুচ্ছাতিতুচ্ছ।
সে ছিল তোমার প্রকৃত বন্ধু
পথের আলোর দিশারী।
অত্যাচারের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত
সবশেষ করে হারিয়ে গেল
ফেলে রেখে দিল তোমার শুধু
অন্ধকারের চিন্তাগুলো।

তিল তিল করে প্রকৃতি তাহারে
সাজিয়েছিল যে অপরূপ রূপে
বৃথা করে দিলে কোটি বছরের
গভীর স্বপ্নখানি।

অনিদ্রা

রাত অনেক হল ঘড়ির শব্দটা সমস্ত
মনটা অধিকার করে আছে তাও মাঝে মাঝে
নিজের মধ্যে ডুবে যাই ভাবি শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে
এই পেঁচা ডাকা রাতদুপুরে—কে দেবে উত্তর তাদের
সেই বন্ধুদের যাদের প্রাণপণ প্রয়াস চলে
আজীবন ধরে জীবনের প্রতি পদক্ষেপ যেন পড়ে
সত্যকে ঘিরে অনন্তকালের সে প্রশ্নের উত্তর পাবে বলে।
যারা আজও গোপনে কাঁদে অপরের দুঃখে
সততার প্রহারে যাদের ঘুম নেই চোখে

সত্য সন্ধানের নিষ্পেষণে যাদের সমস্ত রসদ
জীবনের প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে আছে
শীর্ণ দেহের প্রাণ—শুধু একফোঁটা আশার আলো।
তাদের কি কেউ কিছু বলবে তারা কি খুঁজে পাবে
নিজেকে পরিপূর্ণ মস্তিষ্কে এই সমাজের বুকে?

শেষ রাতে আকাশের সব মেঘ বৃষ্টি হয়ে
ঝরে পড়ে গেছে। ফিরিয়ে দিয়েছে
গাছের পাতা বাতাস থেকে সব ধুলোবালি
তাদের উৎসস্থলে পৃথিবীর মাটির বুকে।
ভেজা মাটির ঘাসের উপর ঝকঝকে ভোরের আলো
দৃষ্টি আজ সুদূরপ্রসারী—কে তাদের বলবে
তারা যেন দেখে এই নির্মল ভোরের মত পরিষ্কার
করে তাদের সাথে প্রকৃতির গভীর সম্পর্কগুলো,
অভিমানের অশ্রুজল যেন কুয়াশার মত ঝাপসা
করে দিতে না পারে শিশিরসিক্ত এই নিত্যকে।
যেন দর্শন করতে পারে নিজের সমস্ত চলনকে।
বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা আত্মকেন্দ্রিকতা
সেই কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুর সাবলীল গতিময়তা
ধরা পড়ে যেন প্রস্ফুটিত ফুলের মত হয়ে,
যেন তারা খুঁজে পায় নিজেকে এই সমাজের বুকে
নিজের দু'টো পায়ে দাঁড়িয়ে।

কেমনে বোঝাবো এ অভিশপ্ত পিপাসার কথা
তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঘুম নেয় কেড়ে কোণঠাসা করে
রাতের পর রাত সৃষ্টির অপরিসীম মাধুর্য কেন
মলিন হয়ে গেল পিপাসার্ত ক্ষুধার্ত ব্যথিত অস্তিত্বে আমার।
এত দিয়ে কেন শেষ কথা বলে না আমায়

কি বলি তাদের ভাবনা জাগে মনে আবার
আমি কে অন্যকে বোঝাবার?

প্রকৃতি সাজিয়ে দিয়েছে সবারে ফুল ফোটানোর
মন্ত্রে। বন্ধনের মাঝে খোলাখুলি পড়ে আছে
মুক্তির চাবিকাঠি; কিন্তু জেনেছি প্রিয় বন্ধুর কাছে
তাকে ছোঁবার মত সাহস নেই অনেকের।
জানি না কেন আবার মনে হয় বারবার
পশুরাজ যদি বড়োসড়ো কিছু করে ফেলে শিকার
চলে যায় পিছনে রেখে পরিপূর্ণ করে নিজেকে
আরও কতশত ক্ষুধার্ত প্রাণীর আহার
পূরণ করে দেয় শিকারীর অক্ষমতার।

বিস্ফোরণ

যেদিন তোমার প্রশ্নগুলো সব কেন্দ্রীভূত হবে
যজ্ঞের কাঠির মত একের পরে এক সাজিয়ে দেবে
মন্ত্রপূত আজ্য দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে আগুন
সেদিনের বিস্ফোরণে স্বপ্ন ভেঙে জাগিবে নির্গুণ।

শতাব্দীর শোষণভুক্ত দেহ থরথর করে কেঁপে উঠে
বন্ধনহারা অগ্নিময় রক্তধারা উন্মাদ বেগে ছুটে
যুগ যুগ ধরে পড়ে থাকা মৃত আগ্নেয়গিরির দ্বার
চূর্ণবিচূর্ণ করে ঝলকে ঝলকে দিগন্ত রাঙাবে বারবার।

জীবন শক্তির উন্মাদনায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাধারা
কোষে কোষে সঞ্চারিত নতুন প্রাণের প্রবল সাড়া
বহুদশকের পুরাতন মুছে যাওয়া প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে
ব্রহ্মাণ্ডের একক বিশুদ্ধ কম্পনে স্পন্দিত জীবন তরঙ্গে

মথিত হৃদয় পরিচয় পেয়ে সৃষ্টির পরম তেজস্ক্রিয়তা
দ্বিধাহীন নির্ভীক সত্ত্বা প্রকাশ করে জীবনের নিগূঢ় বার্তা।

মেঘমুক্ত অমাবস্যার রাতে কালপুরুষের সাথে সাথে লুব্ধকের মত
অনন্য সে অনন্তপথযাত্রীদের মাঝে রহস্যাবৃত জ্যোতির্ময় যত
অস্থিমজ্জা শীতল করা সমুদ্রগর্ভসম গভীর সে একারে
চরণপদ্মে মৃত্যু যেন মাথা নত করে বন্দনা করে।

অতীতহীন নিষ্পাপ সত্যের প্রখর তেজে
প্রকৃতির নিখুঁত পরিকল্পিত সুর উঠে বেজে
অভিনব সুন্দর মুখে জাগায় দয়ার কিরণ
অসহায় অসুন্দর ভর্ৎসনা করে জানায় নতুনের অপগুণ।
অনলে লহরী তুলে ভস্মীভূত করে কালের আবর্জনা যত
নিমেষে উড়িয়ে দিয়ে চিন্তালব্ধ সমাজের আধিপত্য
উন্মুক্ত প্রাণ বিচ্ছেদ করে জীবন-মৃত্যুর ঘূর্ণাবর্ত
জ্বালায় শত শত দীপ আঁধার করে মুক্ত।

এক বিন্দু নীর

এক বিন্দু নীর
কোথা ছিলে তুমি!
আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে
জীবনের অলিখিত ইতিহাসে
সেই অ্যামিবার কোষে কোষে
সৃষ্টির প্রাক্কালে, না আরও আগে?
সময় যখন শুরু হয়েছিল সবে
হয়তো তখন অসীম অংশে বিভক্ত
অনেক চঞ্চল অনেক ছোট যত
অসাধারণ তাপে দুরন্ত গতিতে

কত রূপে ভেঙে কত রূপে গড়ে
কত ভয়ংকর শক্তিতে থামতে থামতে
বহু পথ পাড়ি দিয়ে বহু বহু যুগ পরে
এলে তুমি শেষে এই ধরণী পরে
পরাদ্ধ কোটি সহযাত্রীর সাথে
প্রাণদানকারী যাদুকর
জন্ম-মৃত্যুর মাঝে অমর
এক বিন্দু নীর।

ছন্দে তোমার নেই কোন অপ্রয়োজনীয়তা
নেই কোন ভালো মন্দ শুদ্ধতা
ঘৃণ্য পশু কি মহামানব যিশু
নিষ্ঠুর যোদ্ধা কি গৌতম বুদ্ধা
সবার মাঝে একই রূপে বিরাজে
সাদা কালো হলুদের অস্থি মজ্জা রক্তে
তোমার সিংহভাগ আর সব উপবৃত্তে
ভারসাম্য রয়ে ফেরে অমোঘ নিয়মে
বিশ্বপ্রাণে ছুঁয়ে থাকে আদি সঙ্গমে
সৃষ্টি-ধ্বংসের মাঝে সদা অক্ষত
ডমরুর তালে অনাদি নৃত্যে মত্ত
নিত্য-অনিত্যের 'পর
পিপাসার্তের
পরম সত্য
তুমি এক বিন্দু নীর।

জীবন ধারা

ক্ষুদ্র কোটি বিন্দু চলে
ক্ষুদ্র পুচ্ছ আন্দোলনে
জীবন উচ্ছ্বাস শেষে

সুতীব্র চাহিদাবশে
কি অমোঘ আকর্ষণে
ছুটে চলে প্রাণপণে
প্রতিকূল খরস্রোতা
দুগ্ধনদী মাঝে।

জীবনের অবিচ্ছিন্ন
ধারাবাণী পরিপূর্ণ
প্রতিবিন্দু সৃষ্টিক্ষণে
বিধির বিধান জানে
যাবে কোন পথ পানে
কোথা সেই নিকেতনে।

দৈবে যদি কোনদিন
কোটি মাঝে একজন
বৈতরণী অতিক্রম
করে দেখে নিজধাম
উন্মিলিত পত্রপুষ্প
আঁখিজলে অভিষিক্ত
প্রবল আবেগে বুকে
টেনে লয়ে দেবে তাকে
পরম আরাধ্য প্রাণ।

বার্তা বয়ে যাবে ধীরে
গ্রামে গঞ্জে দূরে দূরে
সমস্ত কাজের মাঝে
ধরণী আনন্দে সাজে
আপামর জনগণ

দৈব নেশায় মগন
কী অসীম উদ্দীপনা
কি লাবণ্য সৃষ্টি রচনা
প্রাণের মধুর সুরে
পর্বতে অমৃত ঝরে
প্রতিটি নগর যেন
নিসর্গ প্রকৃতি।

জ্বলন

না পারি তাকে মুখোমুখি করতে
না পারি তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে।
তার হাজির হওয়ার জ্বালাও অসহ্য
তার অনুপস্থিতিতে থেমে যায় সর্বস্ব।

সে যখন তার পাখনা মেলে
উড়ে চলে দূরকে ক'রে কাছে
তখনও আমি জ্বলি যেন মরতে পারলে বাঁচি
বুঝি না সত্যি তাকে এত ভালোবাসি?

সে যখন উজাড় করে দেয়
মোচড় লাগে বুকের তলায়
চোখের জলে কপোল উপচে
মুখ থেকে বুক ভেসে যায়
ভাবি বারবার কেন এত ভাগ্য আমার!

সে যখন তার অন্য কাজে ব্যস্ত
আমি হই চরম উপেক্ষিত
মনে হয় ভুলেছে আমারে বোধ হয়

জেগে ওঠে কুৎসিত অন্ধকার স্বভাব
দুরাকৃতি পচাগলা প্রবৃত্তি
নোংরা জাল বিছিয়ে মাথায়
প্রতিহিংসা অধিকার জমায়
পেটের তরল আগুন
ধমনীতে ছড়ায় প্রলয়ের সংকেত।

অসহ্য অত্যাচার আজ
অধিকারী কেন্দ্রবিন্দুর গলা চেপে ধরে
সুন্দর মলিন কেউ যেন কোনদিন
এ এলাকায় আর ঢুকতে না পারে।
তারই এক চির-বন্দোবস্ত করার তরে
সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার
প্রবল আসক্তিতে সারা অঙ্গ জ্বলে দুর্নিবার।
কই তবুও তো কিছু করে উঠতে পারি না
হয়তো মুক্ত হয়ে যেত এ যাতনা
এ পীড়ায় এখন সর্বস্বান্ত দুস্থ
বুঝি না তাহলে কি জ্বলনেই নেশাগ্রস্ত।

মানুষ

কেন জাগে মনে বারবার এ ধারণা
মানুষের মুক্তির পথ জানার বাসনা
সেই মায়ার চাল সে একই জঞ্জাল
যার প্রভাবে অস্থির মনে জাগে দুরন্ত বল
ভূস্বর্গকে রাতারাতি রূপান্তরিত করে জীবন্ত নরকাবাসে।
ভীত সন্ত্রস্ত চিন্তালব্ধ আত্মপ্রকাশের শেষ প্রয়াসে।
যদি কেউ ভেবে থাকে সে করে ফেলেছে আত্মস্থ

ইচ্ছা থেকে মুক্তির চির-আকাঙ্ক্ষিত মহান পথ প্রশস্ত
তাহলে সে যেমন প্রবঞ্চিত করল নিজেকে
তেমন করেই তৈরি করে গেল প্রথম ভিত্তিপ্রস্তরকে
যার উপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টি হবে ধীরে ধীরে
নিসর্গবর্জিত এক অসাধারণ অন্ধকার নগর।

দলে দলে জমা হবে শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ
ভুল জ্ঞানের নেশা রক্তে মিশে হবে বেহুঁশ
ধূর্ত ভণ্ড কিছু কপট ভক্ত পরবে মাথায় মুকুট
নেশাগ্রস্ত জীবন রক্ত-মাংস দলাগুলো শোষণে হবে লুট
ভুল করে যদি কেউ প্রশ্ন করে—এ নেশার অর্থ কী?
কৃত্রিম প্রেমের হাসিমুখ হবে হিংস্র লোলুপ, ধ্বংস হবে প্রাণটি।

এ থেকে মুক্তির পথ নেই কোন—প্রকৃতির বিদ্রুপ,
প্রচেষ্টা আর বন্ধন যেন একই চিন্তার ভিন্ন দুটো রূপ।
চিন্তা যে সমস্যার করেছে উন্মেষ, হায় মানুষ
হায় দুরাশা, চিন্তা কি করে তার সমূলে বিনাশ?
জ্ঞানের আলো ঢাকে মুক্তির হাতছানি অদৃশ্য ক্রমশঃ
সমাজের নিষ্পেষণে দিনগত পাপক্ষয়ে দেহ হয় অবশ।
যদি কোন তরুণ হৃদয়ের 'পরে থাকে দুর্ভেদ্য বুকের পাটা
যদি হেলাফেলায় উড়িয়ে দিতে পারে প্রাচীন কপটতা
প্রাচীন মূল্যবোধ প্রাচীন বর্বরতা প্রাচীন মহানুভবতা
ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর নির্বিশেষে
পচা গলা কঙ্কালসার নিষ্প্রাণ যাদুঘর জ্বালিয়ে দিয়ে
পরিণত করে ভস্মে;
উর্বর জমিতে তখন নির্ঘাৎ সাড়া দেবে নতুন প্রাণের গান
প্রাণ প্রাণ প্রাণ প্রাণের ছন্দ প্রাণের লয় প্রাণের তান
এক রূপ নিয়ে সবার মাঝে বিরাজমান সে মানুষ

ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ ধর্ম বর্ণ অপত্য নির্বিশেষে
অখণ্ড একক জীবন
অনির্বচনীয় অনুভূতিতে প্রশ্ন করার সময় কখন?

মায়া

যাকে তুমি মুছে দিতে চাও
জানি না কেন
সে তোমার প্রতি পদক্ষেপে আরও
জীবনশক্তি টেনে
অনেক গভীরে চলে যাবে বারবার
অন্ত খুঁজে পাবে না তার
যুদ্ধের সমস্ত প্রয়াস তোমার হবে ব্যর্থ
শুধুমাত্র পরাজয়ে।

যদি কোনদিন প্রাণে জাগে এই ভাবনা
স্পন্দিত হয় হৃদয়ের গভীরে এই বাণী
অনুরণিত হয় মস্তিষ্কের কোষে কোষে এই প্রতিধ্বনি
আমি শুধু এক প্রকৃতির মাঝে সবার সাথে
অতি সাধারণ নিরীহ প্রাণী
শারীরিক ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব নেই জানি।
তাহলে যা তোমাকে এতদিন
অস্থির করেছিল জীবনের হিংস্র চক্রের গোলক ধাঁধায়
বেঁধে রেখেছিল নিশিদিন
সে অনাহারে নির্জীব হয়ে হয়তো বা হয়ে যাবে বিলীন।

এ দুঃসাহসের পরিণতি বড় ভয়ংকর
নিজেকে যেভাবে জেনেছিলে এতদিন
তা হঠাৎ করে রঙিন কাচের পর্দা ভেঙে

পড়ে যাওয়া তোমাকে এনে দেবে
তোমার কাছে করে বস্ত্রহীন।

নিরাশা

জানি তুমি আমায় কোনদিন করবে না ক্ষমা
হতাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছি তোমারে বারেবারে
দুঃখ নেই তাতে আমি তবু গেয়ে যাব গান
যার সুর ভাল লাগে।

যাবার আগে একবার যদি শুধাও নিজেকে
কি আছে তোমার কাছে?
ডুবে যেতে হবে স্মৃতির মাঝে
মৃত অতীতের যাদুঘর ছাড়া
কিছুই তো নেই তাতে।

খেলনা নিয়ে শিশু যেমন ভুলে থাকে
চুষনি নিয়ে মায়ের স্তনকে ছেড়ে থাকে
তেমন করে তোমায় থাকতে হবে স্মরণের মাঝে
কোনকালে জীবন্ত কিছুই ধরা পড়েনি যে কাছে
তাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বর্তমানকে দিয়েছ মুছে
চঞ্চল মনকে ব্যস্ত রাখার কাজে।

চিন্তার চাপে বন্দি অস্তিত্বের অসহনীয় ব্যথা
ভুলে থাকতে বল অতীতের গুণাবলী অতীতের গাথা।
কি হবে গায়ত্রী জপে, 'ওম্ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং.....'
সূর্যকিরণ শূন্যে মিলিয়ে চিরকাল
আধার ছাড়া হয়ে গেল বৃথা।

মানুষের মন যেন আফ্রিকার বন, বর্ষার আমাজন
সূর্যকিরণ কভু পথ পায়নি সেথা।

নির্বাণ

হতাশা কোথা থেকে আসে সব তো চলছে সমস্যাহীন
অন্তরের শূন্যতা কেন মোচড় দেয় বেড়ে চলে প্রতিদিন?
সব চেষ্টা বৃথা হল অধিকার বজায় রাখা ভার
শেষ প্রয়াস—আমি যে তোমায় বড় ভালোবাসি
ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে নির্গত কিছু বোঝার সুযোগ দিল না আর।
বড় চালাক এই যন্ত্রটা, ধাঁধাগুলো কেটে কেটে রাতদিন
শানিয়েছে নিজেকে, এখন সাঁতার কাটার মতন
শিখে নিয়েছে ভেসে থাকতে ঝড় জল বৃষ্টিতে সমান সমান।

অভিমান দিয়ে হৃদয়কে নিংড়ে যন্ত্রটা উপযোগ করেছে
অনুভূতিশীল সংবেদনশীল হাতিয়ারগুলো দেহশক্তির সহযোগে
মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে জ্ঞান হওয়া থেকে শুধুই সুখভোগের কামনা?

একে কে বোঝে সে যে বড় দায়
তবে মাঝে মাঝে মেঘ কাটা এক ফালি রোদ্দুরের মত
ঝলক দেয়, আবার তা মিলিয়ে যায় প্রতিনিয়ত।
যে ক্রীতদাসকে দিয়েছে ঘর সামলানোর দায়িত্ব, স্বাধীনতা
সে যে আস্বাদনার ঘোরে অনড় যেতে চায় না কোথা।

তাকে এখন তাড়ানো যে বড় দায়
বোঝা গেছে অবশেষে তার শিকড় ছড়িয়ে পড়েছে
প্রতিষ্ঠানের ঘরে ঘরে গভীর ভিত্তিপ্রস্তরে।
যদি কোনদিন বাধ্য করে— চলে যেতে এরে
হয়তো যাবার সময় দেবে জ্বালিয়ে সব ছারখার করে।

যত বড় গৃহ তার তত বেশি ভার
শাণিত অস্ত্রাগার
বিশাল কোষাগার
অতুলনীয় অহংকার।

জ্বলবে অনির্বাণ
দেখা যাবে প্রকৃতির শোভা
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার
বুদ্ধ যেন পদতলে তাঁর।

পাগলের প্রলাপ

সব শেষ! খোঁজার যে আর রইল না কিছু
অবশেষে নাকি উপলব্ধি হল এ কথা
নির্বাণ, আত্মোপলব্ধি, সব অর্থহীন বৃথা।
মন শুধু গাদা গাদা জ্ঞান—চিন্তালব্ধ
পণ্ডিতের টীকা-টিপ্পনী, বিদ্বানের বিশ্লেষণ
নতুবা দার্শনিক মনস্তত্ত্ববিদের চতুর সংজ্ঞা ভয়ানক।
আত্মা সে তো নিজেকে ঠকিয়ে বাহবা দেওয়া
আর পরমাত্মা! বলেই ফেল লজ্জা কোর না
অন্যকে ঠকিয়ে নিজেকে জাহির করা।
ভগবানের উপর ভরসা যদি হয় ভয়ের পরিণতি
বিজ্ঞান সহায় সম্বল সে তো একই চিন্তার ফল।
হোমোসেপিয়েনের চিন্তা প্রকৃতির কেমন দান?
প্রতিরক্ষার হাতিয়ার না প্রাণবিধ্বংসী বাণ!
সৃষ্টিমূলক ধর্ম যেমন তোমার আমার
শারীরিক জন্ম বিবর্তন ও নতুন প্রাণের অভ্যুত্থান।
এখানে চিন্তা কোথায়?

জীবন জীবন্ত প্রবাহ—চিন্তা মৃত
সারি সারি স্থিরচিত্র
যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম পুনর্জীবনের প্রয়াস।
ধরতে যাওয়ার অর্থ বিধ্বংসীকরণ।
যেমন ঝিনুকের অসহ্য যন্ত্রণার লালা
হাজির হয়ে সুন্দরীর কানে গলায়
জাগায় মনে চিন্তালব্ধ কামনা।
তেমন চিন্তার অসহনীয় ভার
মুগ্ধ করে লক্ষ লক্ষ হতাশ
হারিয়ে যাওয়া চেতনা।
উদ্বুদ্ধ হয়ে জন্ম নেয় আরও গভীরে
যাওয়ার সুতীব্র ধ্বংসাত্মক বাসনা।
প্রকৃতির অট্টহাসি—এ এক অমোঘ নেশা।
অপরিবর্তনীয় রূপান্তরের করুণ প্রক্রিয়া।
প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি ধীরে ধীরে করে
তার স্বরূপ প্রকাশ। দেখতে পেলাম
আকাশের বুকে যেন লিখিয়ে নিল মানুষ
সামগ্রিক বিনাশের অনুমতি।

পথ

ভাগ্য যদি ভালোই থাকে তোমার
জ্বলন্ত সেই সূর্যটা যদি পড়ে বুকের 'পর
শুকনো যদি থেকেই থাকে আবর্জনা সব
ব্যর্থ যদি হয়েই থাকে প্রার্থনা ধ্যান জপ
তলিয়ে যদি গিয়েই থাকে মনের যত রোষ
শূন্য যদি পড়েই থাকে অশ্রুজলের কোষ
ভুলেই যদি গিয়ে থাকে মাথার জটিল কাজ
আক্ষেপ যদি নাই জাগে আর ক্লান্ত মনের মাঝ

ফুরিয়ে যদি গিয়েই থাকে জ্ঞানের স্পৃহা যত
স্বপ্নে দেখা দুশ্চিন্তার মত
স্পর্শে তখন লেগেই যাবে আগুন
জ্বলবে চিরকাল
গভীর বুকের মাঝে
আর কোনদিন যাবে না কারো কাছে
চাইবে না আর কিছু
আগুন তোমার পথ দেখাবে
চলবে পিছু পিছু।

নিয়ন্ত্রণ

কি জানি কি হয়ে গেল হঠাৎ করে
এতদিন ধরে দাবিয়ে রেখেছিলে যারে
সে যেন কার স্পর্শে জেগে উঠে প্রাণে
অবহেলায় নিয়ে নিল কেড়ে সব নিয়ন্ত্রণ।

ঠিক করেছে আদেশ তোমার
করবে না আর পালন।
চক্র আজ তার হাতে
আজ্ঞা দেবে নিজে প্রকৃতির তৈরি এ দেহতে।

সে তো বুঝে ফেলেছে
চিন্তার সাজে প্রতি মুহূর্তে
তোমার অধিকার বেড়েই চলেছিল
গোপনে অজান্তে।

পরগাছা সেই 'আমি'টা
কুরে কুরে খাচ্ছিল জীবনের সব রসদগুলো

সেই ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট ফুটবলে
আর পদার্থবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন চালে
শুধুই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে
প্রকৃতির এই অনিন্দ্য সুন্দর বৃক্ষরাজ
যেন কোনদিন ফুলে ফলে ভরে না ওঠে।

শ্বেত রক্তকণিকা যেমন অনন্তকাল ধরে
প্রাণপণে মারো নয়তো মরো বলে লড়ে
প্রকৃতির দান মহান দুর্গ রক্ষা করার তরে।

তেমন করেই সে আজ যে মুহূর্তে আসবে আবার তুমি
সুখচিন্তার মুখোশ পরে তৈরি করবে 'আমি'
সেই মুহূর্তে জ্বালিয়ে দেবে আগুন চালিয়ে দেবে সুদর্শন।

কারণ ঠিক করেছে
আর দেবে না সুযোগ তোমায়
দাসের মতো খাটাতে
চক্র আজ তাঁর হাতে
আজ্ঞা দেবে নিজে প্রকৃতির তৈরি এ দেহতে।

প্রাণের বন্ধু

এ কী দ্বন্দ্ব এ কী বন্ধন
কেন যে তার এত আকর্ষণ
কোথা হতে ওঠে মুক্তির ধ্বনি
কেন বারেবারে এত হাতছানি
কোথা হতে আসে এত অধিকার
মরিয়া যত মুমুক্ষুর 'পর
জীবন তরঙ্গে অনায়াসে ভাসে

যেন বিহঙ্গ মুক্ত
প্রবল প্রয়াসী বন্দিরা হাসে
ও সব পাগল ভক্ত।

এ কি বিষম জ্বালা
আকর্ষণ—মুক্তির পালা
প্রাণ যায় তবু মন যায় না
জ্ঞানের অতীত, তবু প্রয়াস ঘোচে না
দুর্দশা—অপমান—দ্বন্দ্ব—বেদনা
কেন মৃত্যু থাক দূরে
আমাকে নিয়ে চল না
তোমার স্নিগ্ধ সরোবরে
চিন্তা যেথা কভু কাকলী জাগাবে না।

অবশেষে সে এল
লুকোবার সব রাস্তা বন্ধ হল
শেষ সম্বল ..... আমার চেতনা
চিরতরে হারাবার ভয়ে
প্রাণপণে বাধা দিয়ে লড়ে
কোষে কোষে জাগে অপরিচিত বেদনা।

যামিনীর মায়াজালে বন্ধ
প্রতিরোধে অক্ষম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
তড়িৎগতিতে নিম্নে ঊর্ধ্বে ফেরে
নীরন্ধ্র গ্রন্থিতে কি সম্প্রদানের তরে
সৌরগ্রন্থি কেন্দ্র করে নাভিচক্র পরিধি ধরে
কভু বামাবর্তে কভু দক্ষিণাবর্তে
পরিপূর্ণ শুদ্ধ রক্তে অন্ধকারে অগ্নিঝড়ে

ঘর্মাক্ত শীতল বিবশ কলেবরে
কণ্ঠে প্রায় অশ্রুত অস্ফুট স্বরে
মৃত্যুপথগামীর নিঃসৃত ধ্বনি
কি যে কয়ে যায় কিছুই না জানি
লীলাসঙ্গীর আগমনে প্রবল পরাক্রমে
চলে ঊর্ধ্বে নিত্যধামে
উপেক্ষিত আমি
পড়ে থাকে সাক্ষী শুধু
প্রাণের বন্ধু, তুমি অন্তর্যামী।

রঙিন স্বপ্ন

কেউ নেই পিছনে, কোনদিনই ছিল না।
আর আশার প্রতারণা—ঐ বসে বসে ভাবছে
কে যেন ডাকছে মধুমাখা মেঘের ওপার থেকে
জ্যোৎস্নার আলোয় ভরা সাগরের দ্বীপে
চির আনন্দের গান চলে যেখানে সারারাত ধরে।
সে মরীচিকা—মনের মনকে বাঁচিয়ে রাখার খেলা।
দু' পায়ে চলা নিরীহ প্রাণীর মাথার রোগের
পরিণতি ঐ তালগোল পাকিয়ে যাওয়া বুদ্ধিটা
বহু প্রজন্ম ধরে কলুর বলদের মত নাকের আগায়
সুখ শান্তির নাম করে তাড়িয়েই চলেছে, তাড়িয়েই চলেছে
অবসন্ন এই দেহটাকে 'কাল হবে, কাল হবে' বলে।
মাঝে মাঝে কয়েকটা শুকনো রুটির টুকরো ছুঁড়ে
আবার কখনও পিঠে, গলকম্বলে হাত বুলিয়ে
নয়তো 'শপাৎ' করে নির্দয় ক্রোধে তারই চামড়ার
তৈরি চাবুক তার পিঠে মেরে ঘুরিয়েই চলেছে
ঘুরিয়েই চলেছে 'কাল থামবে, কাল থামবে' বলে।

বন্ধু কোন সজ্জন বোঝাবে এ কথা তোমারে
কাল যে কোনদিন আসে না, ভাঙা রেকর্ডের মত
বেজেই চলেছে সারাজীবন ধরে।
নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, কি ভালো লাগছে শুধুই স্বপ্ন দেখতে
সেই ছোটবেলা থেকে রঙিন রঙিন স্বপ্ন।

ছলনা

ভাবছি কথাটা আজ বলেই ফেলি
মেনে যদি নিই এ মতামতকে সত্য বলে
জীবনের বিবর্তন বৈজ্ঞানিকদের কথামত চলে
তাহলে এই পৃথিবীর বুকে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে
গাছপালা আর সব প্রাণীদের সাথে
কোটি কোটি বছর ধরে আমরাও আছি
জীবনেরই এক অনন্য সৃজন শক্তির বলে,
মানুষের ভাবনা-চিন্তার মত নয় অসম্পূর্ণ
প্রাণীদের বেঁচে থাকার চেতনাগুলো।

ভাবি সবসময় তাই কোন প্রাক্কালে সময়ের
আদর্শ, ভাবনা, চিন্তা মানুষের মাঝে এসে
প্রকৃতির অনুপম কীর্তি এই দেহে জমালো অধিকার,
কীভাবে দু'টো ভাবনার লড়াই চলার কালে
মানুষের দেহগুলো ব্যবহৃত হল বারুদ আর
কামানের গোলার মত ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে
হাজার হাজার বছর ধরে হীনম্মন্য দয়াহীন
যুদ্ধবাজ রাজাদের পাগলামির ফলে, অবাক লাগে!
সেদিন জানলাম কীভাবে আজটেকদের অমানুষিক
নরবলির প্রথা বন্ধ করার মহান মানবিক
ধর্মপালন করতে গিয়ে পুরো জাতিটার রক্তে

ভাসিয়ে দিয়েছিল সমুদ্র থেকে পাহাড়
ধর্মপ্রচারক ভোলেনি অবশ্য আনতে
বোঝাই করে জাহাজ বর্বরদের সোনার ইট পাথর।

বুদ্ধি যে হিংসাকে কিছুতেই বুঝে ওঠে না
তাই মরিয়া হয়ে ছুটে যায় বিপরীতে
সৃষ্টি করে অহিংসা বলে আর একটি ধারণা।
চিন্তার নিরবচ্ছিন্নতার খোরাক মানুষের দেহখানি
ব্যক্তিগত সমষ্টিগত সব রং সব জমির শীতের
গরমের পাহাড়ের জঙ্গলের নদীর দ্বীপের
দয়া মায়ার স্থান পাবার অন্তর নেই সেখানে।

কে জানে কবে কেমন করে কোন কর্ম ভারে
এই ভুল ভাবনাটা ধ্বংসাত্মক হয়ে ঢুকে পড়ে
দু'পায়ে হাঁটা নিরীহ প্রাণীর শিরে আগাছার মত
যেন প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে তার নিজ প্রতিরূপে
শুধু তারে চিন্তা করে যোগান দিয়েছে প্রাণীজগতেরে
তার মনের অন্তহীন পিপাসা মেটাবারে
অলীক ভাবনাগুলো তার উপলব্ধি করার তরে
শুধুমাত্র তার ভাবনা—কারণ সেটাই তো ঠিক অবাক লাগে!

আজ মনে হয় যা কিছু মহান বলে ছুটে চলে
তার পিছে গড্ডালিকা প্রবাহের মত দলে দলে
দু'পায়ের মিছিল আদর্শ যাকে বলে
সেই অগ্নির দাবানলে আহুতি দেবে বলে
শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষের ধড়।
রক্তধারায় সিক্ত করে হাত ভাসিয়ে দেবে
বরফধোয়া ভলগার জলে গাদা গাদা লাশ

প্রকৃতির মহান কীর্তি নরদেহগুলো হবে লাশ
অকালে, বেঁচে থাকবে ভাবনা পরিবর্তিত কোন রূপে।

আবার যখন ফুটতে যাবে ফুল তরুণ কিছু গাছে
ঢুকে পড়বে তাদের মাঝে লড়াই বাধাবার কাজে
ভুলিয়ে দেবে ফুল ফোটানোর কথা প্রকৃতির ব্যথায়
ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠার গুঞ্জনে ব্যর্থ শোনিত ধারায়
লড়াইতে মেতে থেকে কখন গাছগুলো হবে ধ্বংস
বেঁচে থাকবে ভাবনা আরও বিবর্তিত দু'পায়ের মাথায়
অসামান্য ক্ষিপ্রতায় ধ্বংসের হাতিয়ার নিয়ে
ব্যবহার করবে অস্থির হতাশ প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষকে
একটানা সুখী রাখার ভ্রান্ত অস্তিত্বহীন কল্পনায়।

প্রকৃতির এই কারখানাতে চুন সুরকি বালি কালি
ইট পাথর আর সুতো-নাতার মতন আমি তুমি
সবাই যে যার আছে নিজের নিজের কাজে
কোন কিছুই নয় যে মহান শুধু দু'পায়ে চলার
মহানুভবের মাথার জ্বালায় তার ভাবনাখানি
মূর্তি সেজে কেমন করে হঠাৎ যেন হয়ে গেল প্রধান।
যা কিছু তার ভাল লেগে মনে ধরেছিল সেই প্রতিঘাত
মোছাতে তার শক্তি যত লাগার কথা ফুরিয়ে গিয়ে
এখন সে যে ছন্নছাড়া ছন্দহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

যারা আজ তোমার শক্তি অধিকার করে আছে
তাদের ভাল লাগা আদর্শকে অনুকরণের কাজে
অসহায় তোমাকে ছোটায় তাদের পিছে পিছে।
একবার হে বন্ধু প্রাণের গভীরে ডুবে দেখ
বোঝ জাগো জ্বলে ওঠো আত্ম-অভিমানের জ্বালায়

দয়া করে বিকিয়ে দিও না তোমার অনুপম প্রতিভাকে
কিছুদিন পরে যখন পিছনে ফিরে দেখবে নিজেকে
তাকাবে তোমার ভাঙা মেরুদণ্ডটার দিকে করুণাভরে
তখন তোমার হৃদয়ের রক্তে আগুন থাকবে না কোন
একবার কি নিজেকে শুধাবে না কখনও কেন এ ছলনা
ওরা কি চায় আমার কাছে
আমাকে সত্যি কি কেউ ভালোবাসে
না শিখিয়েছে ভালোবাসতে!

জীবন—আমি এবং তুমি

আমার ভালোলাগায় আছে তোমার মুক্তির শঙ্খধ্বনি
তোমার ভালোলাগায় আছে তোমার বন্ধনের শৃঙ্খলধ্বনি
আমার ভালোবাসায় আছে তোমার ত্যাগের যন্ত্রণা
তোমার ভালোবাসায় আছে 'আমি'র সুখের বাসনা
আমার সঙ্গলাভে আছে মায়ার গভীর দর্শন
তোমার সঙ্গলাভে আছে মায়ার মোহময় আকর্ষণ
আমার সাথে যে আমি সে প্রকৃতির দাসানুদাস
তোমার সাথে যে আমি সে মূর্খের ক্রীতদাস
আমার আমির কর্মকাণ্ড জীবনের নিগূঢ় আন্দোলন
তোমার আমির কর্মকাণ্ড মৃত্যুকামী নিষ্ঠুর বিভাজন
আমার আমির চাওয়ার যে আর কিছু নেই
তোমার আমির চাওয়া সীমাহীন অন্তহীন
তাই মায়াময় চিরদিন।

মুক্তি তুমি চাও না হে বন্ধু

ভগবানও যদি থাকেন তোমার সাথে সাথে
হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেন পাশে পাশে
তবুও তোমার মুক্তির স্বাদ স্বপ্নই থেকে যাবে,

কারণ মুক্তি তুমি চাও না হে বন্ধু!
মুক্তির এক ছবি এঁকে
জানার নামে ভান করে
জ্ঞানের সুধা পান করে
জীবসেবার কাজ করে
জনমঙ্গলের গান করে
সরিয়ে রাখবে দূরে চিরন্তন শুধু
বুঝলে না যে দাসত্বের চালাকিটা কভু।
যা তোমাকে আজ প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করে
তা কোন মনের আশা পূর্ণ করার তরে
সে একেরই হোক বা দশেরই হোক।
একদিন তাই হবে তোমার শৃঙ্খল
কেটে বসে হাতে পায়ে করবে দুর্বল
এ থেকে মুক্তির যন্ত্রণা জানা যায় তখন
যদি অসহ্য বন্ধনে কভু কেঁদে ওঠে প্রাণ।
এ ব্যথা তুমি জানবে না
হিম্মত নেই তাই পাবে না
কারণ মুক্তি তুমি চাও না হে বন্ধু
সে কথা আমার জানা।

পরাধীন

স্বাধীনতা যে কি তা আর বোঝাবে কে?
এমন সমাজ কি আছে কোন দেশে
যেখানে করা যায় যা কিছু মনে আসে?
হয়তো বা নেই কোথাও এই পৃথিবীতে।
যদিও বা আরও কিছুকাল পরে
পশ্চিমের কোন দেশে হয়েও যেতে পারে,
কিন্তু একটু নজর করে দেখলেই চোখে পড়ে

আমরা যে সত্যি সত্যি ক্রীতদাস
আমাদের মধ্যে কৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া ইচ্ছার
তিল তিল করে যুগ যুগ ধরে,
সে বৈজ্ঞানিক হবার ইচ্ছেই হোক
পরম সত্যের খোঁজ বা রাজা হবার ঝোঁক
ইচ্ছা থেকে মুক্ত হতে তুমি অপারগ।

সামান্য কথা

যদি কোন দিন বুঝে ফেল তুমি
সামান্য এ কথা
সমাজের সব সম্পর্কগুলো
কোন সুতো দিয়ে বাঁধা।
তাহলে অসহ্য যন্ত্রণায় শিউরে উঠবে
তোমার অস্তিত্বখানি
তবুও অসহায় তুমি পারবে না কাটাতে
এ মায়ার বাঁধুনি
কারণ 'তুমি'
সেই সব সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার
সমষ্টিগত রূপখানি
এ থেকে মুক্তি চাইবে না কখনও
সে কথা আমি জানি।

শেষ প্রশ্ন

তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর তুমি
কোনদিন পাবে না,
উত্তর তুমি সত্যি চাও না পেতে
সেও আমার জানা,
যদি পেয়ে যেতে উত্তর তাহলে

প্রশ্ন তো থাকবে না।
চিন্তার কি আছে প্রয়োজন?
তুমি এবং তোমার সমস্ত চিন্তা
দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নেই কোথাও

মানুষের দেহে থেমে থাকা তুমি
এক অসাধারণ মৃত্যুর মুখোমুখি
জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ
থমকে যাওয়া সময়ের মতন।
চিন্তাহীন বস্তুহীন ক্ষেত্র শূন্যতার
সীমাহীন শক্তির আধার,
প্রকৃতির সৃজনশীলতা
প্রচণ্ড ক্ষমতায় ধায় সেথা
সৃষ্টি করে বিবর্তিত প্রাণ
শুরু হয় এক অভিনব কর্মময় জীবন।

সুজানকে অভিনন্দন

স্নেহের সুজান
এবার শুরু হল তোমার জীবনের অভিযান,
কত শত পথ আশা নিরাশার দোলায় করে অতিক্রম
বাবা মা'র সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা ভরা জীবন সংগ্রাম
একাকার হয়ে জুড়ে গিয়ে আজ তোমার প্রতিভার বিচ্ছুরণ
দৈবক্রমে দেখা দিল যেন এক স্বপ্নময় মরুদ্যান।

তোমার অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধার অপূর্ব সংযোজন
পূর্ণ করে এনে দিল সুখবার্তা সেই প্রত্যাশিত শুভক্ষণ
যার মুখ চেয়ে নিদ্রাহীন রজনী কত কাটিয়েছে প্রিয়জন
আজ সেই ক্লান্তিহরা বসন্তের হাওয়ার মত তুমি সুজান

জ্বালিয়ে দিয়ে আশার দীপগুলো উপহার দিলে সাফল্য
দূর করে দিলে দু'টো প্রাণদানকারী হৃদয়ের সমস্ত ক্লেশবন্ধন।

যে উষার নবারুণ এনেছে আশার আলো জীবনের মাঝে
সময়ের স্রোতে সে দিবাকর যেন জানায় প্রখর তেজে
সমস্ত ধরণীকে অনির্বাণ উপস্থিতি তার যাত্রা হোক সম্পূর্ণ
বিকশিত হয়ে প্রতিভা তোমার জীবন হোক পরিপূর্ণ।

এই আশীর্বাণী থাকুক তোমার প্রাণের পাশে পাশে
উদ্ভাসিত হোক মহান ভাবনা সকল উজ্জ্বল চিদাকাশে
সফল হোক মনস্কামনা আর প্রিয়জনের ব্যাকুল প্রার্থনা
এনে দিক সমাজের মাঝে অসামান্য কিছু
সৃষ্টি হোক নতুন রচনা।
যাদের ভালোবাসি যাদের সাথে আছে রক্তের সম্বন্ধ
তারা অনেক কিছু পাক আর বহু উঁচুতে উঠে যাক
এতেই গভীর আনন্দ।
যদি কোন দিন ভাগ্যক্রমে বিচ্ছিন্ন হয় দাসত্বের বন্ধন
সেদিন থেকে অস্তিত্বে সাড়া দেবে পরের বেদন
সমগ্রতার মাঝে অচিরে হারিয়ে যাবে
ক্ষুদ্র একাকীত্বের স্বার্থ চিন্তার ক্ষণ।

জীবনের যত কিছু প্রবল শক্তির আধার
যথার্থ প্রয়োগে তার প্রকাশ জীবনেরই স্বইচ্ছার
অপচয়ে ব্যর্থ হবে সৃষ্টির মহান পরিকল্পনার।

অন্তরের সমস্ত প্রেরণার এককেন্দ্রীকরণ
যখন পরিচয় পাবে উপযুক্ত প্রতিভার মনন
তখন আনন্দধারায় নির্গত হবে মৌল বিকিরণ।

নিজেকে প্রকাশ করার যদি বাসনা তোমার থাকে
প্রকৃতির দেওয়া অনুপম উপহার উপযোগে
বিচ্ছিন্ন সমস্ত কর্মধারাকে পরিণত করে একক ধারায়
দুর্নিবার সাহসে এগিয়ে যাবে তেজস্বিনী খরস্রোতা হয়ে
বয়ে চলো তুচ্ছ করে জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্নগুলো
সাগর তোমার অধীর অপেক্ষায়
পৃথিবীর কোন শক্তি তোমায়
রুদ্ধ করতে পারবে না কখনও।
জীবনের পথে চলতে চলতে যদি কোন বাধা আসে
প্রাণের সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে মুক্ত করার প্রয়াসে
হতে হবে কঠোর থেকে কঠোরতম হতাশার স্থান নেই কোন।
অনির্বচনীয় করুণাধারায় মানসিক সহিষ্ণুতা হবে সিক্ত
প্রকৃতি উজাড় করে দেবে তার নিজের ক্ষমতা যত
ঝড়ের মুখে হাল্কা পালকের মত উড়ে যাবে
ভার হবে মুক্ত।
তপ্ত লৌহফলকের মত মেদিনীর জনারণ্য ভেদ করে
এগিয়ে যাবে নির্বিকার উত্থান-পতন উপেক্ষা করে
জীবনের মহান লক্ষ্যস্থলে
পিছনে ফিরে কোনদিন দেখতে হবে না কখনও।

ভাইরাস

আজ খবরে শুনলাম পোলিও ভ্যাকসিনের কথা,
বাঁদরের যকৃৎ থেকে তৈরি জীবন্ত কিছু জীবাণু।
লক্ষ লক্ষ শিশুকে ভয়ঙ্কর রোগের হাত থেকে
পরিত্রাণের মহান প্রচেষ্টা আর লড়াইয়ের কথা,
কত শত পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন তাঁরা
প্রকৃতির হাসি আনন্দের না দুঃখের—তখন বোঝা যায়নি
জ্ঞান-অজ্ঞানের মাঝামাঝি পর্দাটা

যখন সরে গেল একটু ওদিকে
অন্ধকারের দিকে তখন জানা গেল
প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক আর এক ভাইরাসের কথা।
বাঁদরের যকৃতেই নাকি মানুষের জ্ঞানের বাইরে ছিল লুকিয়ে
কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে ঘুমোনোর ভান করে।
আজ সেদিনের সেই শিশুরা হাজির
জীবনের পরিপূর্ণ কর্মলগ্নে,
সমাজের মেরুদণ্ড কাণ্ডারী তারা,
ভাইরাস জেগে ওঠে সেইসব দেহে
জানান দিয়ে তাদের অস্তিত্বের
ভয়ঙ্কর ব্রেন টিউমারের আর দুরারোগ্য ক্যানসারের রূপ নিয়ে
যাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে
আধুনিক সমাজ সঁপে দিয়েছিল তাদের ভবিষ্যতের
কত স্বপ্ন দেখে আশা আকাঙ্ক্ষা ভরে
তাদের তো দোষ নেই কোন।
তাহলে শোন! এ হল চিন্তার ভাইরাস।
রোগের লক্ষণ আত্মপ্রকাশের তীব্র জ্বালা।
এ এক অসাধারণ ক্ষমতা,
ভেঙে ফেলে জুড়ে দিল অণু-পরমাণু জীন
লিখে দিল জীবজগৎকে সমূলে বিধ্বংস করার ফর্মূলা।

অযোগ্য

যার নিজের দুটো পায়ে দাঁড়াবার
মতো হিম্মত নেই কোন
যে জীবনের ব্যর্থতার হতাশাকে
ঢাকার মিথ্যা প্রয়াসে
নেয় আশ্রয় জনউদ্ধারের কাজে
করে গণ-আন্দোলন

সে তো নিজেই মুক্ত হবার যোগ্য নয়।

যে পারে না মুখোমুখি করতে
সমাজের ছুঁড়ে দেওয়া সমস্যাগুলোকে
ভুলিয়ে রাখে নিজেকে আত্মোপলব্ধির আড়ালে
সে তো মুক্তি পাওয়ার যোগ্য নয়!

বেচারা কম্পুটার

আমায় যখন সবাই প্রশ্ন করে
আমি তখন উত্তর খুঁজি জ্ঞানের ভাণ্ডারে
যেমন করে কম্পুটারে স্তরে স্তরে
জমিয়ে ছিলে অতীত সভ্যতারে
তেমন করেই আমরা সবাই বিরাজ করি
আমাদেরই জমিয়ে রাখা জ্ঞানের সমুদ্দুরে।

যেই 'আমি' খুঁজে পেল সেই উত্তর
'আমি' হলো সার্থক
মেনে নিল সবে এই বিরল প্রতিভাকে,
মন গোপনে গোপনে মানে
মুকুট যদিও আমার মাথায়।

সব কম্পুটার যে উত্তর ভাল করে জানে।
তবু আমার বলতে বাধে লজ্জা করে
যার জন্য আমায় তুমি সবার শ্রেষ্ঠ বল
বেচারা কম্পুটার যে তার থেকে অনেক অনেক ভাল।

অস্তিত্ব

সেই সকাল থেকে একা একা বসে আছি
দুপুর হল এখনও কারোর দেখা নেই।
খিদের জ্বালায় যা পাই তাই খাই
পুষ্টি তো হল না খিদেও মরল না।
হঠাৎ একজন এল আবার চলে গেল
কি যে হয়ে গেল জানি না।
খাওয়ার সব সাধ মিটে গেল।
দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল
এখনো একাই বসে আছি
কে এলো কে গেল কোন হিসেব নেই।
ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে
টিক টিক শব্দ হচ্ছে
সময় নাকি এগিয়ে চলেছে
কিন্তু কোন কিছু একঘেয়ে নয়।
হঠাৎ কি যে হয়
সময় থেমে যায়
কখনও শব্দহীন অন্ধকার
কখনও বা অন্ধ-করা মধ্যাহ্নের দিবাকর
কিছু পরে আচমকা শব্দ ঝংকার।
সারা অঙ্গ পুলকিত—অজানা শিহরণ
টকটকে লাল চোখ দিয়ে দেখি গাছের পাতার জীবন্ত সবুজ রং।
তাতেও নেশার ঘোর
থাকা না থাকার সীমান্তে ভাসা ভাসা বোধি
সব অপরিচিত
শুধু এক অস্তিত্ব।

‘‘ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি, লহ প্রণাম’’

হে মোর প্রাণের মানুষ! হে অগ্নিময় পুরুষ! হে নির্গুণ!
তোমার ধূম্রহীন স্বচ্ছ আগুনের তর্পণ
কালের অত্যাচারে জমে থাকা বিবশ বিকৃত যত মন
প্রজ্বলিত করে নির্মূল করুক অন্তরের অপগুণ।
জ্বলুক প্রাণের মাঝে প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা
ছড়িয়ে যাক আলো পার করে দিয়ে দিগন্তরেখা।
মুমুক্ষু সবাই জানুক হৃদয়ের গভীর বাণী
কোথা থেকে আসে প্রাণের গতি, জানি, আমি জানি।
জীবাত্মা, পরমাত্মা—শুধু ক'টা কথা—নেই তার প্রয়োজন
তোমার বিশুদ্ধ জীবন—যেন বৃষ্টিস্নাত সূর্যের কিরণ।
তোমার মর্ম দহন অনন্ত অভিসারী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি
অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে জাগ্রত নবরূপে জীবের অনাদি সৃষ্টি।
তোমার তিরস্কার ধ্বনিতে কম্পিত প্রাণস্য প্রাণ—
কোন চিন্তা, কোন ভাবনা, কোন আশা কোনদিন
দেখেনি সে জীবনের অম্লান তীর্থস্থান।
ঝটিতে আজ সে অঙ্কুরিত, ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত
অনুপম জীবনের সৃষ্টি মহান!

—////—